প্রকৃতি ও সন্তান

পরমারাধ্যা

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

প্রসূতি ও সন্তান
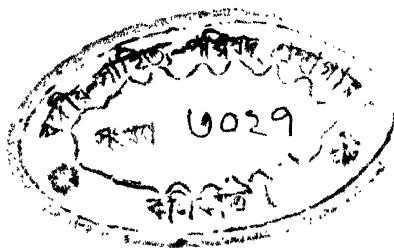
স্ত্রী ও শিশু রোগ চিকিৎসক

শ্রীগিরীন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র

এম-বি, এল-এম (ডাবলিন)

বেঙ্গল পাবলিশিং হোম

৫, নূর মহম্মদ লেন

কলিকাতা

বোর্ড বাঁধাই—১৲ টাকা   সুলভ সংস্করণ, মূল্য—৷৹ আনা

এলবিয়ন প্রেস
৫, নুরমহম্মদ লেন
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বেঙ্গল পাবলিশিং হোম
৫, নুরমহম্মদ লেন
শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সূচিপত্র

প্রসূতি

সন্তান

দ্রষ্টব্য—সংখ্যা সকল পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশক

নিবেদন

কৈশোরে পল্লীগ্রামে যে সমস্ত সূতিকাগার দেখিয়াছি, তাহার চিত্র এখনও মন হইতে অপসারিত করিতে পারি নাই; ডাক্তার হইয়া প্রসূতি ও সন্তানের পরিচর্য্যা যাহা দেখিতেছি, তাহা মনের মধ্যে সর্ব্বদাই জাগরুক রহিয়াছে; পাশ্চাত্যদেশে ডাবলিন (আয়ারল্যাণ্ড) ও এডিনবরার (স্কটল্যাণ্ড) ও অন্যান্য স্থানে প্রসূতি ও সন্তান সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা দেখিয়াছি ও শিক্ষা করিয়াছি, তাহা মনের মধ্যে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। যখনই ভাবিয়া দেখি যে দেশের উন্নতি বা অবনতির সহিত

প্রসূতি ও সন্তানের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক,—ও সেইসঙ্গে আমাদের দেশে প্রসূতি ও সন্তানের ব্যবস্থা ও পরিচর্য্যা যেরূপ সর্ব্ব সময়েই দেখিতে পাই, তাহাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ভারতের জাতীয় উন্নতি যে কতদূর, তাহা চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।

যে দেশে শিশুর জন্ম ও মৃত্যুহার এত অধিক, যে দেশে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও অলসতা এত ভীষণ, যে দেশে জনপিছু আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছুই নয়, যে দেশে স্ত্রীজাতির সম্মান শাস্ত্রমধ্যেই নিহিত, যে দেশে মানুষের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, ব্যক্তিগত মূল্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে দেশের লোক নিজের ও দেশের উন্নতি পৃথক ভাবিয়া, স্বার্থপর জীবন যাপন করে, যে দেশের লোক মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অলসতার সমস্ত ভার ভগবানের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চিরাভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, যে দেশে অমানুষিক-মনোবৃত্তি ও ক্ষুদ্রতার সীমা দ্রুত বিস্তৃত হইতেছে—সে দেশের জাতীয় উন্নতি বহুদূর। প্রসূতি ও সন্তান পালন,—শিক্ষা, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; সুতরাং ইহার আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেই এই সমস্ত প্রসঙ্গ স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এক, বহু বা অসমান বিবাহের শাস্ত্রসম্মত মত হইলেও (?), হীনবল বা মৃতপুত্র শাস্ত্রোক্ত "পুত্রার্থের" মত যে নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "পুত্রার্থের" উদ্দেশ্য—যে পুত্র, বংশের গৌরব ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে। পিতামাতার বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা যুক্তিসঙ্গত ; আমাদের দেশে ২৩।২৪ বৎসরের পিতা ও ১৫।১৬ বৎসরের মাতা, উভয়ের বয়সের মধ্যে ৭।৮ বৎসরের পার্থক্য থাকাই বিধেয়। স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র ও 'মানুষের' মত সন্তান উৎপাদন ও পালন করিতে হইলে পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংযম ও চরিত্রবল একান্ত আবশ্যক।

নারীজাতির স্বাস্থ্য, চরিত্র ও শিক্ষার উপর সন্তানের প্রথম জীবন, ও প্রথম জীবনের উপর তাহার ভবিষ্যত নির্ভর করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা মাতৃজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন এবং এই উদাসীনতার ফলে সাধারণ গৃহস্থের পরিবার নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি দিন দিন বীতরাগ হইয়া পড়িতেছেন। গৃহস্বামীর অসুস্থতার জন্য যেরূপ ভাবেই হউক কিছু ব্যবস্থা হইয়া থাকে, কিন্তু গৃহিণীর চিকিৎসার বিষয়ে সময়, সুযোগ ও অর্থের অনাটন প্রায়ই দেখা যায়। শাস্ত্রমতে

সম্মান প্রদর্শন করিলেও, আমরা যে নারীজাতির সম্যক মূল্য দিই না, ইহাতে মতদ্বৈধতার কারণ দেখি না।

আমাদের জাতীয় শিক্ষাব অবনতির সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার আবর্জ্জনা মিশ্রিত হইয়া, আমাদের চিন্তার ধারা বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে এবং আমাদিগকে আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিযাছে। আমাদের দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে কোন্‌টা আমাদের জাতিকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়, এবং কোন্‌টাই বা উন্নতির সহিত খাপ খায় না, এই বিবেচনা লইয়া আমাদিগকে বর্ত্তমান নব উন্মেষের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষণের দিনে, ধীর পাদবিক্ষেপে চলিতে হইবে। আমাদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিলেও, আধুনিক প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিলে চলিবে না; চিকিৎসা বিষয়ে ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দিদিমার পরামর্শই সম্পূর্ণ বাহাল রাখিতে হইবে তাহাও যুক্তিপূর্ণ নহে,—কিন্তু "দিদিমার আলুইবড়ি অতএব পরিত্যাজ্য" এরূপ বিচারও অযুক্তিপূর্ণ। এ বিষয়ে স্বতঃই কবির কথা মনে পড়িয়া যায়ঃ—

"একটি ঘরে জ্ঞানের আলো, শতঘরে আঁধার কালো,
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, নৈলে এ দেশ এমনি রবে;"

ডাক্তার এফ, জে, ব্রাউনের "প্রসূতির স্বাস্থ্য বিষয়ে উপদেশ" ও ডাক্তার এফ, ট্রাবি কিংএর—"প্রসূতি ও সন্তানের প্রথম মাস" পুস্তিকা পড়িয়া আমার ঐ জাতীয় একখানি সকলের উপযোগী পুস্তক প্রণয়নের ইচ্ছা হয়,—আমি এই জন্য, ও তাঁহাদের পুস্তকের সাহায্য পাওয়াতে, উভয়কেই ধন্যবাদ দিতেছি।

সাহিত্যরসিক বন্ধুবর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ডাক্তারী ভাষার খোঁচখাঁচ সারিয়া দিয়া, আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব যাঁহারা আমাকে এই পুস্তক লিখিবার সময় উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন— তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তকখানি যাঁহাদের জন্য লিখিত, তাঁহাদের কাজে লাগিলে, এবং আমাদের দেশের প্রসূতি ও সন্তানের সাহায্যে আসিলে, নিজের শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

৫/১এ, নুর মহম্মদ লেন
কলিকাতা
২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

সূচনা

২৫শে অক্টোবর ১৯২৯ সালে স্যার নরম্যান মেজোরিব্যাঙ্কস্ মাদ্রাজ রোটারী ক্লাবে পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের আহার শরীর ধারণোপযোগী নহে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যও হীনবল। শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখিবার উপযোগী সমস্ত প্রকার উপাদান বিশিষ্ট উপযুক্ত পরিমাণ আহার আমরা পাই না; এবং খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞানও যে অল্প সে বিষয়েও সন্দেহ নাই (১১—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৯২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ইংলণ্ডে গড়ে মানুষ ৫১ বৎসর, আমেরিকায় ৫৬ বৎসর, জাপানে ৪৪ এবং ভারতবর্ষে ২২ বৎসর বাঁচিয়া থাকে; ১৯০০ সালে ইংলণ্ডের লোকে গড় পড়তায় ৪৪ বৎসর, আমেরিকায় ৪৭, জাপানে ৩৬ বৎসর এবং ভারতে ৩২বৎসর বাঁচিত; এই ২৫ বৎসরে অন্যান্য দেশের আয়ু বাড়িয়া চলিয়াছে, ভারতে কিন্তু জীবনী-শক্তি কমিয়া গিয়াছে।

১৯০১ সালে	জন্ম	হাজারে	৩৩	জনের,	মৃত্যু ৩৫	জনের
১৯১১ ,,	,,	,,	৩০	,,	মৃত্যু ৩৮	,,
১৯২১ ,,	,,	,,	২৭	,,	মৃত্যু ৩৭	,,

ইহা হইতে সহজে অনুমিত হয় যে আমাদের জাতি ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

বাংলা দেশে প্রতি মিনিটে ২ জন ম্যালেরিয়ায়, প্রতি ৩০ মিনিটে ১ জন কালাজ্বরে, প্রতি ৩ মিনিটে ১ জন নিউমোনিয়ায়, প্রতি ৪ মিনিটে ১ জন আমাশয়ে, প্রতি ৪ মিনিটে ১ জন কলেরায়, প্রতি ৫ মিনিটে ১ জন ক্ষয় রোগে মারা যায়; এতদ্ব্যতীত বসন্ত, প্লেগ, ও অন্যান্য ব্যাধিও আছে।

ভারতে ৪টী করিয়া শিশু প্রত্যেক মিনিটে মরে। লণ্ডনে প্রত্যেক ১০০০ শিশুর মধ্যে ৭০, টোকিওতে (জাপানে) ১০৫টী, ও কলিকাতায় ৩১০টী শিশু ১৯২৪ সালে মারা যায়—অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের শিশুমৃত্যুর হার ৩।৪ গুণ। কলিকাতায় ৪০ জন প্রসূতির মধ্যে ১ জন মারা যায়, ইংলণ্ডে ২০০০ জনের মধ্যে ১ জন মারা যায়; প্রসবের সময় ৬০।৭০ হাজার প্রসূতির মৃত্যু ঘটে।

পূর্ব্ব লিখিত হিসাব নিকাশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মৃত্যুহার অত্যন্ত অধিক; রোগ ভোগ, পঙ্গুতা, স্বাস্থ্যহীনতা যে অধিকতর তাহার কোন সন্দেহই নাই। ইহার মূলে নিহিত—অজ্ঞতা, মূর্খতা, কুসংস্কার ও অলসতা। অন্যান্য দেশে সকলেই লিখিতে পড়িতে জানে; আমাদের দেশে মাত্র শতকরা ৫ জন লেখাপড়া জানে। চলিত কুসংস্কার অনিষ্টকর বুঝিতে পারিলেও, পরিত্যাগ করিতে আমরা অত্যধিক উদাসীন; শয়ন কক্ষে বা আঁতুড়ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস চলাচলের প্রয়োজনীয়তা (২২, ৬২, ৭১, ৯১, ১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেও, কার্য্যক্ষেত্রে কয়জন তাহা পালন করেন? সম্প্রতি কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের গৃহে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে, আগুণ রাখিয়া ঘরের জানালা, কপাট সমস্ত বন্ধ করিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইবার ফলে প্রসূতি, শিশু ও ধাত্রী—তিনজনেরই মৃত্যু হইয়াছে!

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, আমাদিগকে মানুষের মূল্য দিতে শিক্ষা করিতে হইবে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে কুসংস্কার দূর করিতে হইবে; রোগ নিরাময়ের জন্য "রোজা" না ডাকিয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

চির আচরিত কুপ্রথা, সংস্কার ও কুব্যবস্থার পুষ্টিসাধন না করিয়া সেগুলিকে অপসারিত করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশগুলি জ্ঞান ও চেষ্টার ফলেই তাহাদের দেশে মৃত্যুহার দিন দিন কম করিতেছে, আয়ু বৃদ্ধি করিতেছে ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতেছে। প্রসূতি ও সন্তান দেশের সম্পদ, এ সত্য তাহারা সম্যক উপলব্ধি করে এবং তাহারা মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত; তাহারা ভাল-ভাবেই বোঝে যে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে শিশুকে রক্ষা করিতে হয় এবং শিশু সমস্যাই জাতির একমাত্র সমস্যা। আমাদিগকেও এই পথ অনুসরণ করিতে হইবে।

সকলের আর একটী বিষয় মনে রাখা আবশ্যক যে স্ত্রী ও পুরুষজাতি জীবন সংগ্রামে সহযাত্রী; একের মানসিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য অপর জন সর্ব্বসময়ে তুল্যভাবেই দায়ী, এবং শরীর ও মন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বচ্ছন্দতার প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।

প্রসূতি ও সন্তান

গর্ভাধানের পর হইতে প্রসবের পর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাতার ও তাঁহার আত্মীয়গণের কর্ত্তব্য যে তাঁহার শরীরের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখেন। গর্ভাধান ও প্রসব স্ত্রীলোক মাত্রেরই সাধারণ শারীরিক নিয়ম, ইহা কোন ব্যাধির মধ্যে নহে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ ও অংশের কার্য্য সন্তানের পরিপুষ্টির জন্য সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা অধিক করিতে হয়, সুতরাং এই অধিক কার্য্য করিবার উপযোগী করার চেষ্টাও প্রসূতিকে করিতে হয়—তাহা না হইলে সন্তানের পরিপুষ্টি কম হয় এবং প্রসূতির শরীরেরও ক্ষয় হয়, ফলে প্রসূতির স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং হীনবল সন্তান উৎপন্ন হয়। প্রসূতির কর্ত্তব্য কি কি, ইহা সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে হইলে (১) প্রসবের পূর্ব্বাবস্থা, (২) প্রসবের সময় (৩) প্রসবের পর প্রসূতির সাধারণ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসা, এই কয়টী অবস্থায় কি কি হয় ও কি কি করা উচিত, তাহাই বুঝিতে হইবে।

প্রসবের পূর্ব্বাবস্থা।

গর্ভাবস্থায় পরীক্ষার উপকারীতা।

এই সময়, গর্ভাধান হইতে প্রসব কালের অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থা পর্য্যন্ত, ধরা যাইতে পারে; প্রসূতির স্বাস্থ্যের দিকে এই ২৮০ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে চরকের আয়ুর্ব্বেদেও ২।১টী অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে; খৃষ্টীয় ছয় হইতে ৪ শতাব্দী পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বেও, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তৎকালীন জ্ঞান অনুযায়ী, প্রত্যেক মাস হিসাবে, মাতার কর্ত্তব্য, তাঁহার আহার, নিদ্রা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি কি করা উচিত, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। প্রসব একটী সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম, অবশ্য তাহা যথোচিত তত্ত্বাবধান-সাপেক্ষ। মাতা ও সন্তানের স্বাস্থ্যও এই সময়ে পরিচর্য্যার উপর অনেকটা নির্ভর করে। সন্তানের পুষ্টিসাধনের জন্য (যকৃৎ) লিভার, (মূত্রগ্রন্থি) কিডনি, হৃদপিণ্ড ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের উপর বিশেষ ভার পড়িয়া যায়। শরীরের এই সব অংশের

অধিকতর কার্য্যের জন্য, তাহার বিরাম ও বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহার ব্যতিক্রমে কোন একটী অংশ পীড়িত হইয়া প্রসূতির স্বাস্থ্যের হানি করে ও সন্তানকে হীনবল করিয়া ফেলে। এই সময় ভাল করিয়া লক্ষ্য রাখিলে শতকরা অন্ততঃ ৯০টী প্রসূতি রোগের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, সুস্থ ও সবল সন্তান প্রসব করিতে পারেন।

কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এইবার বলা যাইতে পারে :—

(১) লিভার ও কিডনি এই দুইটী যন্ত্র শরীরের বিষাক্ত ও অনাবশ্যক পদার্থ বাহির করিয়া দিতে সাহায্য করে। গর্ভাবস্থায় লিভার ও কিডনিকে, প্রসূতি ও সন্তান এই উভয়েরই শরীরের, বিষাক্ত ও অনাবশ্যক পদার্থ বাহির করিয়া দিতে হয় বলিয়া ইহাদের কার্য্য অনেক বাড়িয়া যায়। অনেক সময় ইহারা ঠিকমত কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া রোগের সৃষ্টি হয়, হাত পা ফুলিয়া যায়, প্রস্রাব কমিয়া যায় এবং আক্ষেপাদিরও (ফিট) আরম্ভ হয়। লিভার ও কিডনির কার্য্য সুচারুরূপে হইতেছে কিনা, তাহা গর্ভাবস্থায় শরীরের প্রতি

লক্ষ্য রাখিলে, ও পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়। প্রসূতির যদি হাত, পা, চোখের কোল ফোলে, প্রস্রাব মাত্রায় কমিয়া যায়, কিংবা শরীর খারাপ হয়, তবে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান আবশ্যক।

(২) অনেক সময় প্রসব-পথ সন্তানের শরীরের অপেক্ষা ছোট থাকে; এ ক্ষেত্রে প্রসবকালীন বহু ব্যাঘাত ঘটে; ফলে, ছেলেকে কাটিয়া বাহির করিতে হয়, সন্তানের মৃত্যু হয়, এমন কি প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানিও ঘটে, বা সুবন্দোবস্তের অভাবে প্রসূতি চিররোগগ্রস্থা হন। প্রসবের পূর্ব্বাবস্থায় পরীক্ষা করাইলে, এবং প্রসবপথের ও সন্তানের আয়তনের আন্দাজ জানা থাকিলে, এই সমস্ত বিপত্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যথেষ্ট অনায়াসসাধ্য। এই প্রসবপথ মাপিবার সাধারণ নিয়ম অতি সহজ, ও কোমরের অস্থির মাপ বাহির হইতেই লওয়া যায়, সুতরাং প্রসূতির এ বিষয়ে সঙ্কুচিত বা ভীত হইবার কিছুই নাই।

(৩) সাধারণতঃ সন্তানের মাথাই প্রথম বাহির হয়। অনেক সময়, পা কিংবা পাছাও প্রথম দেখা দেয়; অনেক সময়

সন্তান জরায়ু মধ্যে আড়ভাবে থাকে ; এই প্রকার প্রসবে বহু সন্তান নষ্ট হয়। যদি গর্ভাবস্থায় পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে গর্ভের শেষ মাসে সন্তানকে ঘুরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ; তাহাতে সন্তান হানির সংখ্যা কম হইবে ও প্রসূতিরও কষ্ট বহুল পরিমাণ লাঘব হইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় পরীক্ষার উপকারীতা-বিষয়ক বহু দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এ কথা অনেকেই বুঝিতে পারেন যে গর্ভাবস্থা প্রায় ৯ মাস কাল থাকে ; এই সময় গর্ভসম্বন্ধে যদি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সঠিক জানা থাকে, প্রসবের দিন যদি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত থাকে এবং প্রসব সময়ে কি হইতে পারে তাহাও জানা থাকে, তবে প্রসবের সময়ের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সময় মত, অস্বাভাবিক উপসর্গের জন্য চিকিৎসাধীন থাকিলে, মাতার রোগসৃষ্টিও কম হয় এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও কমিয়া যায়। গর্ভাবস্থায় নিজের শরীর যাহাতে সুস্থ অবস্থায় থাকে, তাহার চেষ্টা করা, নিজেকে চিকিৎসকদ্বারা ৩, ৬ ও ৯ মাসে পরীক্ষা করাইয়া লওয়া, এবং প্রসবকালের জন্য ব্যবস্থা করিয়া প্রস্তুত থাকা, প্রত্যেক মাতারই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য সমস্ত দেশেই প্রসূতিগণ এইরূপ পরীক্ষা করাইয়া থাকেন

বলিয়াই ঐ সমস্ত দেশে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার আমাদের দেশ অপেক্ষা বহু কম ; এ বিষয়ে আমাদের দেশেও মাতা ও তাঁহার আত্মীয়গণের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

সাধারণ গর্ভাবস্থা।

২৮০ দিনে সাধারণতঃ সন্তান ভূমিষ্ট হয় ; শেষ মাসিকের প্রথমদিন হইতে গর্ভাবস্থা ধরা হয়।

প্রসবের দিন নির্দ্ধারণ।

কোন্ দিন যে প্রসব হইবে, তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া সব সময় সম্ভবপর নহে। শেষ মাসিকের প্রথম দিন হইতে ৯ মাস—৭ দিন যোগ দিলে প্রসব দিন মোটামুটী পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহার ৭ দিন আগুপিছু হইতে পারে ; যথা—যদি ৭ই জানুয়ারী গত শেষ মাসিকের প্রথম দিন হয়, তবে অক্টোবর মাসের ১৪ই প্রসবের দিন হইতে পারে। সুতরাং শেষ মাসিকের প্রথম

দিনের তারিখ বেশ ভাল করিয়া মনে রাখিতে হয়, নতুবা দিনের হিসাবে ভুল হইয়া যাইতে পারে।

গর্ভাধানের লক্ষণ।

১। মাসিক বন্ধ হওয়াই গর্ভাধানের প্রথম লক্ষণ : এ লক্ষণটী কিন্তু বেশ নির্ভরযোগ্য নহে ; কারণ অনেক সময় শরীর খারাপ হইলে, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে, কিংবা স্থান ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইলেও মাসিক ঋতু বন্ধ হইয়া যায়।

২। প্রাতে গা বমিবমি করে—সকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় সামান্য গা বমি করা হইতে বিশেষভাবে বমি পর্য্যন্ত হয়। ইহাও যে সঠিক গর্ভের লক্ষণ তাহা নহে ; কারণ, বদ্ হজম বা কৃমির দরুণও এইরূপ গা বমির ভাব ঘটিতে পারে। অনেকের এই লক্ষণ একেবারেই প্রকাশ পায় না ; সুতরাং সকালে গা বমি করে নাই বলিয়া যে গর্ভের সঞ্চার হয় নাই, ইহাও বলা চলে না।

৩। স্তনের পরিবর্ত্তন—গর্ভাধানের তৃতীয় সপ্তাহে

স্তনে সামান্য বেদনা বা উহা ভারী বোধ হইতে পারে। তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে কিংবা তৎপূর্ব্বেও, স্তন টিপিলে সামান্য সাদা সাদা জলের মত বাহির হইতে পারে; এই সময় স্তনের বোঁটা উঁচু হইতে থাকে এবং তাহার চারিধারে কাল দাগ পড়ে, চলিত ভাষাতে যাহাকে "ভেলা" পড়া বলে। ধীরে ধীরে স্তন আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও ভেলার মাপও বাড়িয়া যায়।

৪। পেট বড় হওয়া—তৃতীয় মাসের পর পেট বড় হইতে থাকে। পাঁচ মাস পর্য্যন্ত পেটবড় বেশ ভাল করিয়া বোঝা যায় না: পাঁচ মাসের পর তলপেট টিপিলে নাভির কাছ পর্য্যন্ত জরায়ু অনুভূত হয়। এই বৃদ্ধি অতি ধীরে ধীরে হয়; সুতরাং তলপেট যদি খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া ওঠে, তবে সাধারণতঃ অন্য কোন রোগ হইয়াছে ধরিয়া লইয়া চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত। সাধারণ গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ষষ্ঠ মাসে নাভীস্থলে, ও নবম মাসে বুকের "কড়ার" নিকট অনুভূত হয়। যদি ষষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে, জরায়ু নাভীস্থলের উপর অনুভূত হয় এবং রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকদ্বারা পরীক্ষা করান কর্ত্তব্য।

৫। ছেলে নড়া—চারি হইতে সাড়ে চারি মাসের মধ্যে ছেলে নড়া অনুভব করা যায়; এই সময় হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত ছেলে নড়া অনুভূত হয়। যদি তিন দিনের বেশী এই নড়াচড়া বন্ধ থাকে, ও পেট বড় হওয়া বন্ধ হইয়া যায়, এবং স্রাব হয়—তাহা হইলে শিশুর প্রাণহানি হইয়াছে ধরিয়া লইয়া চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত। গর্ভে সন্তানের মৃত্যুতে ভয়ের বিশেষ কারণ নাই; প্রায়শঃই এইরূপ মৃত সন্তান নিজেই ভূমিষ্ঠ হয়; তাহা হইলেও, সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত, এবং প্রসবের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক; কারণ, প্রসবের পর নানাপ্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সমস্ত লক্ষণ ব্যতিরেকে, অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারাও গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না জানা যায়; তবে সেগুলি চিকিৎসকের আয়ত্তাধীন,—সাধারণের নহে।

প্রসব সময় আরম্ভ হওয়ার লক্ষণ

প্রসব বেদনার সহিত, বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, সামান্য রক্ত স্রাবই প্রসবকাল উপস্থিতির লক্ষণ। প্রসব বেদনা কোমর হইতে উঠিয়া তলপেট পর্য্যন্ত আসে, এবং নিয়মিতরূপে খানিকটা অন্তর অন্তর এই বেদনা অনুভূত হয়। যখন এই বেদনার অন্তরায় অতি অল্প, ও বেদনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে প্রসবের সময় উপস্থিত। "ভেদাল ব্যথা" বা ভুল-প্রসব-বেদনা অনেক সময় হয়—কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এইরূপ 'কলিকে'র মত ব্যথা হইতে থাকে : প্রায়শঃ প্রসবের ১৫ দিন পূর্ব্বেও এইরূপ ব্যথা হইতে পারে। ক্যাষ্টর অয়েল বড় চামচের ১ চামচ, বা চা চামচের ৪ চামচ খাইলে, এইরূপ ব্যথা কমিয়া যাইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য

(১) আহার

১। উপযুক্ত আহার মাতা ও সন্তানের জন্য বিশেষ

আবশ্যকীয় ; সাধারণতঃ যে সব খাদ্য প্রসূতিকে গর্ভের পূর্ব্বে সুস্থ অবস্থায় রাখিয়া থাকে, সেইরূপ খাদ্যই গর্ভের সময়ে উপযোগী।

এই স্থলে খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের শরীর ধারণ করিবার, বা শরীর ও মনকে কার্য্যকরী রাখিবার জন্য কতকগুলি খাদ্যের বিশেষ আবশ্যক। মোটরগাড়ী চালাইবার জন্য, পেট্রোল ও মোবিল অয়েল, দুই প্রকার তৈলের আবশ্যক হয় ; একটী, মোটর গাড়ীর এঞ্জিন চালাইবার জন্য, অপরটী, যাহাতে কলকব্জা চলিবার সময় ঠিকভাবে ঘোরে, এবং আটকাইয়া না যায়, তাহার জন্য। সেই প্রকার, খাদ্যের মধ্যে যে যে পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকটীর কার্য্য ভিন্নরূপ ; মাংস, পেশী, হাড়, স্নায়ু প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন ভাগের জন্য এক প্রকার খাদ্যের আবশ্যক, এবং এই সমস্তগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য অন্য প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। খাদ্যের মধ্যে, শরীরাংশ পুষ্টি করার পক্ষে যে উপাদানের অভাব হইবে, শরীরের সেই অংশের ক্ষয় হইবে এবং কার্য্যকরী ক্ষমতাও কম হইয়া যাইবে। খাদ্য ও তাহার পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য এ বিষয়গুলি বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক। অতিরিক্ত

পরিমাণে খাইবার আবশ্যক নাই ; এঞ্জিন যেমন আবশ্যকের অতিরিক্ত তৈল গ্রহণ করিতে পারে না, এবং অতিরিক্ত তৈল প্রদান করিলেও তাহা কাজে না লাগিয়া বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ অতিরিক্ত কোন প্রকার খাদ্য আহার করিলে, শরীর তাহা কাজে লাগাইতে পারে না এবং বাহির করিয়া দেয়। এই অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য পাকস্থলী ও নাড়ীকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার জন্য ইহারা জখম হয় এবং পেটের অসুখ, লিভারের দোষ, ডায়েবেটিস ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগেরও সৃষ্টি হয়। অপর পক্ষে, খাদ্যের কোন উপাদান-বিশেষের অভাব হইলেও, শরীরের যে অংশের খোরাকের অভাব হইতেছে, তাহার ক্ষতি হয়, ও কার্য্যকরী ক্ষমতা কমিয়া যায় ; এবং বেরি বেরি, রিকেট্স, স্কার্ভি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ও তৎজনিত অন্যান্য রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং খাদ্যের পরিমাণ, খাদ্যের মধ্যে আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষ বর্ত্তমান আছে কি না, এই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। খাদ্যের মধ্যে যত প্রকার খাদ্য আছে, প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিলে (১) প্রোটীন্ বা জীবদেহের যবক্ষারজান বিশিষ্ট উপাদান (২) কার্ব্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার বা পালো জাতীয় উপাদান, (৩) চর্ব্বিজাতীয় উপাদান,

(৪) লবণ জাতীয় উপাদান ও (৫) ভাইট্যামিন জাতীয় উপাদান এর প্রত্যেকটী পাওয়া যায়। এক একটী খাদ্যে একটীর ভাগ অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা অধিক থাকে। নিম্নলিখিত তালিকায়, যে-খাদ্যে যে-জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে, তাহাই দেখান হইল :—

(১) প্রোটীন্ জাতীয় উপাদান-বহুল পদার্থ, যথা :—মাংস, দুধ, বার্লি, যব, গম, জৈএর আটা বা ছাতু, মটর, মসুর, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি ডাল ; বাদাম, আখরোট, চকোলেট, কোকো, ডুমুর।

(২) কার্ব্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার বা পালো জাতীয় উপাদান-বহুল পদার্থ, যথা :—দুধ, বার্লি, যব, গম, চাল, মধু, গুড়, চিনি, ডাল, ডুমুর।

(৩) চর্ব্বিজাতীয় উপাদান-বহুল পদার্থ, যথা :—দুধ, ঘি, মাখন, তৈল, ননী।

(৪) লবণ জাতীয় উপাদান-বহুল পদার্থ :—লবণ, চুন।

(৫) ভাইট্যামিন জাতীয় উপাদান-বহুল পদার্থ :—এই জাতীয় জিনিষ টাট্‌কা ফল, দুধ, কড্‌লিভার অয়েল, তরকারী, শাক সবজী, লেবু, ডিম, দুধ ও মাখনে পাওয়া যায় ; যদি আমাদের

খাদ্যে এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে কোনটার অভাব হয়, তবে শরীর বেশ কার্য্যক্ষম থাকে না, কিংবা বেশ খাটাও যায় না।

লিভার ও কিডনিকে সাধারণতঃ গর্ভের সময় বেশী কাজ করিতে হয়; সেই জন্য মাংস গর্ভের সময় না খাওয়াই উচিত। যে সমস্ত জাতীর মাংসই প্রধান খাদ্য, তাহাদেরও মাংস খুব কম খাওয়া উচিত। আমাদের দেশে গর্ভাবস্থায় মাংস নিষিদ্ধ বলাও চলে। মাছ সামান্য পরিমাণে খাওয়া চলিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় শরীরের যন্ত্রগুলির উপর বেশী কাজ পড়াতে, এবং সন্তানের পরিপুষ্টির জন্য আহার সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া খাদ্যের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ দেখা গিয়াছে, যে মাতার আহার্য্য কোন উপাদান-বিশেষে হীন হওয়ায়, তাঁহার সেই সময়কার গর্ভের সন্তান, রিকেট প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে।

সন্তানের পরিপুষ্টির জন্য খাদ্যের আবশ্যক হয়, এই ধারণায় অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আহার করিবার আবশ্যক হয় না;

হজম-শক্তির অনুপাত অপেক্ষা অধিক আহার করিলে, মাতার শরীর ও সন্তানের পরিপুষ্টির হানি হইয়া থাকে। সুতরাং যে পরিমাণ খাইলে বেশ সহজেই পরিপাক হইয়া যায়, এবং অম্বল, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য বা শরীরের অলসতা হয় না, খাদ্য বাছিয়া সেই পরিমাণই খাওয়া উচিত : উল্লিখিত সমস্ত প্রকার উপাদান যাহাতে যাহাতে বর্ত্তমান থাকে, এই সমস্ত খাদ্যই বাছাই করিতে হয়।

গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ অনেকেরই 'অরুচি' হইয়া থাকে ; এইজন্য তাঁহারা যতপ্রকার অনিষ্টকর খাদ্য আছে, তাহাই সেই সময় পছন্দ করেন ; ইহা অত্যন্ত অন্যায়। সময়ে পরিমাণ-মত উপযুক্ত আহার গ্রহণ করিলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং আহারেও রুচি থাকে ; এককালীন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় আহার করা অনুচিত। সাধারণ সুস্থ অবস্থায় যে সমস্ত খাদ্য শরীরের পক্ষে উপযোগী, সেই সমস্ত খাদ্যই গর্ভাবস্থায় পরিমাণ-মত খাইলেই চলিতে পারে ; তন্মধ্যে দুগ্ধ গর্ভাবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য। অনিয়মে যখন তখন যথেচ্ছা আহার অনুচিত। তাড়াতাড়িতে ভাল করিয়া না চিবাইয়া খাওয়া সকল সময়েই হজমশক্তির মহা শত্রু, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

চা, কফি যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। চা কিংবা কফি খালি পেটে সর্ব্ব সময়েই নিষিদ্ধ; কিছু না খাইয়া চা খাওয়া বিশেষ হানিজনক। অনেকে বিস্কুট খাইতে পছন্দ করেন, কিন্তু মুড়ি খাইতে নারাজ; মুড়ি ও বিস্কুটে বিশেষ পার্থক্য নাই।

জল খাওয়া বিশেষ দরকারী; অন্ততঃ ২ কোয়ার্ট বা দেড় সের জল প্রত্যহ খাওয়া আবশ্যক। সাদা জলই সব সময় বাঞ্ছনীয়; তবে সোডা, লেমনেড প্রভৃতিও খাইতে আপত্তি নাই। প্রচুর জলীয় পদার্থ গর্ভাবস্থায় বিশেষ আবশ্যকীয়; ইহাতে কোষ্ঠ কাঠিন্য কম হয় এবং বিষাক্ত পদার্থও শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়।

কোনরূপ মদ্য পান করা উচিত নহে—এমন কি ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে "ম্যানোলা", "ভাইব্রোনা" প্রভৃতি টনিকও খাওয়া উচিত নহে।

(২) শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য ব্যায়াম ও পরিশ্রম, হিসাব মত এবং নিয়মিত করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে আমাদের দেশের উপযোগী দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। স্ত্রীলোকদের সাংসারিক কাজ প্রায়শঃই করিতে হয়; কাহাকেও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে খাটিতে হয়, কাহারও বা এই খাটুনির পরিমাণ অল্প। পল্লীগ্রামে প্রায় সকলকেই পুষ্করিনী কিংবা ইন্দারা হইতে বড় বড় কলসে জল আনা, ভারী ভারী বাসনের বোঝা পুকুর ঘাটে লইয়া যাওয়া ও মাজা, রান্না করিবার সময় বড় বড় হাঁড়ী উনানে তোলা, নামান, বা এই প্রকার সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। যাঁহারা সহরে বাস করেন ও ঘরের সাংসারিক কাজ নিজেরাই করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে রান্নাঘরের ধোঁয়ার মধ্যে কিংবা চারিধার বন্ধ বাটীর মধ্যেই সমস্ত দিন থাকিয়া কাজ করিতে হয়। সাংসারিক কাজ করিতে যে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যায়াম অর্থে যে শারীরিক পরিশ্রম বোঝায়, তাহা নহে; কিন্তু পরিশ্রম দ্বারা ব্যায়ামের কার্য্য অনেকটা হয়। শরীরের

প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়মিত চালনা, ও কার্য্যক্ষম রাখিবার প্রয়াসকেই, ব্যায়াম বলা চলে। সাংসারিক কাজ করিলেই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের নিয়মিত চালনা হয় না, কতকগুলি মাংস পেশীর কম বেশী চালনা হইয়া থাকে ; সুতরাং শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে, ও শরীরের ভিতরকার অনাবশ্যকীয় বাজে জিনিষ বাহির করিয়া দিতে, নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়ামের একান্ত আবশ্যক।

প্রত্যেক স্ত্রীলোকের যাহাতে বুক ও পেটের মাংসপেশী বেশ সবল ও সুস্থ থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সন্তান প্রসবের সময় পেট ও বুকের মাংসপেশী কাজে লাগে। সুতরাং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম নিয়মিতরূপে করেন। প্রত্যহ মুক্ত বাতাসে শরীরের মাংসপেশীসমূহ শক্ত করিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ অন্ততঃ দশবার করা ভাল।

গর্ভের শেষ ছয় মাস কাল সমস্ত প্রকার অধিক খাটুনির কার্য্য, না করাই উচিত। পরিশ্রান্ত হইলেই, ব্যায়াম বা শারীরিক খাটুনি বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামের যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ মানসিক ব্যায়ামেরও প্রয়োজন। গর্ভকালীন অধিক চিন্তাশীল কাজ, বা মনের উদ্বেগজনক কাজ না করাই উচিত। মন যাহাতে বেশ প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই সমস্ত ব্যায়াম ছাড়াও, তাঁহাদের মুক্ত বাতাসে অন্ততঃ রোজ ২।১ ঘণ্টা থাকা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা মুক্ত বাতাস প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা সহরতলীতে বাস করেন, তাঁহাদেরই এই বিষয়ে অধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। রাত্রে শুইবার ঘরের দরজা ও জানালা খোলা রাখা উচিত; তাহাতে বাতাস চলাচল হয়। ইহাতে বেশ সুনিদ্রাও হয় ও স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

অনেকের ধারণা আছে যে ঘরের জানালা খুলিয়া নিদ্রা গেলে ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিজনক। হঠাৎ গরম ঘর হইতে ঠাণ্ডায় বাহির হইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি বা জ্বর হইবার সম্ভাবনা। অনেকেই, বিশেষতঃ শীতকালে, দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রা গিয়া থাকেন এবং রাত্রে প্রস্রাব করিতে প্রায়ই খালি গায়ে বাহিরে আসেন; এইরূপ

গরম ঘর হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডায় বাহিরে আসিলেই ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়। জানালা খুলিয়া ঘরের জানালা হইতে তফাতে শুইলে ঠাণ্ডা লাগে না এবং ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচল হইবারও সুবিধা থাকে ; ইহাতে শরীরের শ্রান্তি দূর হয় এবং সুনিদ্রাও হইয়া থাকে এবং ঘরের বাহির হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনাও কম থাকে।

যথেষ্ট পরিমাণ নিদ্রা ও বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক।

বিশ্রাম—নিয়মিত ব্যায়ামের যেরূপ প্রয়োজন, বিশ্রামেরও সেইরূপ অত্যধিক আবশ্যক। প্রত্যহ দুপুরে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করা দরকার ; এই সময় নির্জ্জন কোলাহলশূন্য কক্ষমধ্যে শুইয়া থাকা যাইতে পারে। বিশ্রামের সময় শরীরে কোন প্রকার আঁট জামা ইত্যাদি রাখা কর্ত্তব্য নহে। গর্ভের যত দিন বেশী হইবে, বিশ্রামের পরিমাণও তদ্রূপ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

ঘোরাফেরা যত দূর সম্ভব কম করা উচিত। গর্ভের প্রথম কয় মাস এখানে সেখানে যাওয়া আসা যাইতে পারে, কিন্তু শেষের

কয়মাস রেল, গরুর গাড়ি বা মোটরের ঝাঁকানিতে ঘোরাফেরা না করাই উচিত। মাসের যে কয়দিন মাসিক হইত, সে কয়দিন একেবারেই নিষিদ্ধ। যে সমস্ত গাড়ীতে ঝাঁকানি বেশী হয়, সে সব যানে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। গর্ভের শেষ মাসে দূরদেশে বেড়াইতে যাওয়া একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। যাঁহাদের কখনও গর্ভপাত বা ছেলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

মানসিক বিশ্রামেরও এই অবস্থায় একান্ত আবশ্যক ; যে সমস্ত চিন্তাতে শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনা আনয়ন করিয়া থাকে, সেগুলি বর্জ্জন করাই বিধেয়। হঠাৎ লাফাইয়া উঠা, রাগান্বিত হওয়া, বা অত্যধিক শোকে অভিভূত হওয়া, এইপ্রকার কোন উত্তেজনা হঠাৎ যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে প্রসূতির ও আত্মীয়-গণের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথায়, প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই অনিষ্ট হইয়া থাকে।

নিদ্রা—যে ঘরে বেশ হাওয়া চলাচল করে, এরূপ ঘরে শয়ন করা উচিত ; প্রত্যহ রাত্রে অন্ততঃ ৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন।

স্নান।

যাহার যেরূপ সহ্য হয় সেইরূপ স্নান করা আবশ্যক। শরীর এরূপ পরিষ্কার রাখিতে হইবে যাহাতে শরীরের সমস্ত ঘাম বেশ নির্গত হয়। শরীর বেশ পরিষ্কার থাকিলে কিডনির কাজ কমিয়া যায়, সুতরাং নানা ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। গর্ভাবস্থায় প্রথম ৪।৫ মাস পুকুরে স্নান করা যাইতে পারে; কিন্তু শেষের কয় মাস পুকুরে স্নান বিধেয় নহে। কারণ মুক্ত বাতাসে বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করা, বা ঘড়া-ভর্ত্তি জল আনা এই সময় যুক্তিসঙ্গত নহে; পুষ্করিণী হইতে ঘড়া-ভর্ত্তি জল আনা গর্ভিণী স্ত্রীলোকের কোন সময়েই কর্ত্তব্য নহে।

নিয়মিতরূপ দাঁত পরিষ্কার রাখা উচিত।

স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য দাঁত পরিষ্কার রাখা বিশেষ আবশ্যকীয়। গর্ভাবস্থায় এ বিষয়ে দৃষ্টি অধিকতর ভাবে রাখিতে হয়। দাঁতের গোড়ায় যদি পুঁজ হয়, সময় নষ্ট না করিয়া তাহার প্রতিকার করা উচিত। দাঁতের ময়লা বা পুঁজ শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী,—হজম শক্তির ব্যাঘাতজনক এবং

কিডনি-জনিত পীড়ার সৃষ্টি-কারণ। বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, ময়লা দাঁত বা অপরিষ্কার দাঁতের গোড়া নানা ব্যাধির কারণ। আমাদের দেশের নিমের দাঁতন করার প্রথা খুব ভাল। ইহাতে দাঁতের গোড়া ভাল থাকে ও দাঁতও পরিষ্কার হয়। যাঁহাদের দাঁতের গোড়ায় পুঁজ বা রক্ত বাহির হইতে থাকে, তাঁহারা নিয়মিতরূপে নিমের দাঁতন করিলে উপকার পাইবেন; যদি পুঁজ বা রক্ত বেশী বাড়ে, তবে দাঁতন করিবার পর গরম জলে মুখ ধুইবার সময়, অঙ্গুলী দ্বারা মাড়ী ভাল করিয়া ঘসিয়া উহাতে "এণ্টিপায়োর" লাগাইলে পুঁজ বা রক্ত পড়া কম হইয়া থাকে। নিমের দাঁতন করা যদি আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধ হয়, তবে নরম "টুথব্রাস" ও বেঙ্গল কেমিকেলের "রদফেন" টুথপেষ্ট জাতীয় দাঁতের মাজন দ্বারা দাঁত মাজিয়া "এণ্টিপায়োর" লাগাইলে পুঁজ পড়া কম হইয়া যায়। লবণ ও খড়ি একত্রে মিশাইলে বেশ ভাল দাঁতের মাজন হয়। পান ও দোক্তা, দাঁত ও হজমশক্তির বিশিষ্ট শত্রু, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। যাঁহাদের দাঁত বা দাঁতের গোড়া খারাপ, তাঁহাদের রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ও আহারের পর, ভাল করিয়া মুখ ধোওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

স্তনের পরিচর্য্যা।

সন্তানের পক্ষে জননীর দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। যাহাতে শিশুসন্তান নিয়মিত ও উপযুক্ত পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ পায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা বা লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক মাতারই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। শিশুসন্তানের যাহাতে স্তন পান করিতে কোন কষ্ট না হয়, গর্ভের ছয় মাস হইতে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি স্তনের বোঁটা সমতল হয়, তাহা হইলে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে প্রত্যহ বোঁটা টানিয়া টানিয়া শিশুর মুখে ধরিবার উপযোগী করিতে হয়। স্তনের বোঁটা প্রত্যহ বেশ করিয়া পরিষ্কার করা উচিত; সাবান জল দিয়া ধুইতে পারিলেই ভাল হয়। বোঁটার উপর দুধ জমিয়া মামড়ি পড়িতে দেওয়া উচিত নহে। গর্ভের শেষ কয় মাস, যদি দুধের জন্য স্তনে বিশেষ ভার বোধ হয়, তাহা হইলে কাঁচলি ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এই কাঁচলী বিশেষ আঁট বা টাইট্ হওয়া উচিত নয়।

প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া উচিত ও কোষ্ঠ-কাঠিন্যের চিকিৎসা।

প্রায়শঃই প্রসূতির কোষ্ঠ-কাঠিন্য ঘটে বা পুরীষ-নির্গম পরিষ্কার হয় না। জল কম খাওয়া, খাদ্যে পূর্ব্বকথিত কোন প্রকার উপাদানের অভাব, এবং নিয়মিত ব্যায়াম না করাই ইহার প্রধান কারণ। যাঁহাদের প্রথম সন্তান হইতেছে, তাঁহারা কোষ্ঠ-কাঠিন্য ব্যারামে প্রায়ই ভুগিয়া থাকেন। প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া উচিত।

প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকেরই গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়; এই কোষ্ঠ-কাঠিন্য বহু ব্যাধির মূল; ইহার প্রতিকার করা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। ঔষধ খাইয়া কোষ্ঠ সরল রাখা অপেক্ষা, খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার ব্যবস্থা করা উচিত। আবশ্যক হইলে ঔষধ খাইতে আপত্তি করা উচিত নহে; অত্যন্ত কড়া জোলাপ বা বিরেচক বর্জ্জনীয়। চা চামচের এক চামচ হইতে আরম্ভ করিয়া, দেখিতে হয় কয় চামচে বেশ সরলভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতেছে—সেইরূপ মাত্রায় ক্যাষ্টর্ ওয়েল, লিকুইড প্যারাফিন, কিংবা সিরাপ অফ ফিগ্‌স সাধারণতঃ

কোষ্ঠ-কাঠিন্যের বেশ ঔষধ। প্রাতে গরমজল একবাটী, রাত্রে সাগু বা যব-সিদ্ধ, লাল আটার রুটী এবং প্রত্যেক আহারের সহিত শাক জাতীয় তরকারী অধিক মাত্রায় গ্রহণ, দুধ খই, কিসমিস, মাখন বা ঘৃত, কোষ্ঠ-কাঠিন্য কমাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। প্রত্যহ নিয়মিত পায়খানায় যাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের মহৌষধ; অনেকের, নিয়মিত পায়খানায় না যাওয়াতে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইয়া থাকে।

(১) প্রত্যহ নিয়ম করিয়া প্রাতে পায়খানা যাওয়া উচিত।

(২) প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া একান্ত দরকার। প্রাতে ১ গেলাস ও শুইবার সময় ১ গেলাস গরম জল কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে সাহায্য করে।

(৩) ফল, শাক-সবজী, চোকলসহ লাল আটা, সাগু, খই দুধ প্রভৃতি এ বিষয়ে উপকারী।

যদি উপরোক্ত প্রক্রিয়াতে কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে ঔষধ খাওয়া উচিত। সিরাপ অফ ফিগস, স্বর্ণমুখী বা হরীতকী ভিজান জল, কিংবা ক্যাষ্টর অয়েল, এক্ষেত্রে উপযোগী ঔষধ।

পরিধেয় বস্ত্রাদি

বাংলাদেশে পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার

নাই ; ঋতু হিসাবে বস্ত্রাদি পরিধান করা উচিত। খুব আঁট জামা পরা উচিত নহে। বেশী হিল-উঁচু জুতা না পরাই উচিত। ভিজা জামা কাপড় পরিয়া থাকা একেবারেই উচিত নহে।

গর্ভাধান হইলে গর্ভ-পাতের চেষ্টা, কিংবা মাসিক করাইবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা, অত্যন্ত অন্যায় ও হানিজনক।

অনেকে গর্ভাধানের পরেও সন্তান প্রসব করিয়া মাতৃত্বের দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন ; সেই কারণ নানা প্রকার ঔষধাদি ব্যবহার করিয়াও থাকেন। এই প্রকার ঔষধাদি শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিকারক এবং অনেক সময় মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্তও হইয়া পড়ে।

স্বামী-সহবাস বিশেষতঃ গর্ভের শেষ তিন মাস বন্ধ।

গর্ভাধানের পর স্বামী-সহবাস না করাই বিধেয় :—গর্ভের শেষ তিন মাস একেবারেই নিষিদ্ধ। ইহাতে নানা প্রকার বীজাণু ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসবের পরে জ্বর প্রভৃতি

পীড়ার সৃষ্টি করে ;—অনেক সময় এই প্রকার পীড়া বহু কালের মত নারীকে রুগ্না করিয়া দেয়।

সময়মত ডাক্তার বা অভিজ্ঞ ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত।

গর্ভাধানের পরই ধাত্রী কিংবা ডাক্তার নিযুক্ত করা উচিত। স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলেই সময়মত ডাক্তার দেখান উচিত, তাহা হইলে বিশেষ গুরুতর রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া সম্ভব।

গর্ভাবস্থার সাধারণ রোগ ও তাহার ব্যবস্থা।

অনেকেই গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার রোগ ভোগ না করিয়া বেশ সুস্থ সবল থাকেন এবং সময়ে সবল শিশুসন্তান প্রসব করেন। সাধারণতঃ, সুস্থ সবল মাতার গর্ভাধান হইতে প্রসবের পর পর্য্যন্ত কোন রোগ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় যে কতকগুলি উপসর্গ অনেকেরই গর্ভের সময় ঘটিয়া থাকে, কিংবা যাঁহাদের এইরূপ উপসর্গ আছে,

গর্ভের সময় তাহা বৃদ্ধি পায়। এইরূপ কতকগুলি উপসর্গ ও তাহার চিকিৎসার বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সমস্ত বলা হইয়াছে।

অর্শ

গর্ভাশয় বৃদ্ধি পাওয়া ও সন্তানের চাপ, অর্শের আংশিক কারণ; সুতরাং যাহাতে কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইতে না পায় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অর্শের বলি পরিষ্কার রাখা উচিত; বলিটাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া রাখা উচিত। যদি বেদনা থাকে, তবে এক টুকরা ফ্লানেল ঈষৎ উষ্ণ রেড়ির তেলে ভিজাইয়া বলির উপর বাঁধিয়া রাখিলে ব্যথা কম থাকে। এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে, সন্তান প্রসবের পর অর্শ ভাল হইয়া যায়।

অম্বল ও বুক-জ্বালা।

প্রায় প্রসূতির অম্বল ও বুক-জ্বালা হয়; আহারের এক

ঘণ্টা পরে এইরূপ অম্বল দেখা দেয়। খাদ্যে এমন একটি জিনিষ আছে যাহাতে এই অম্বল করায়; কিন্তু প্রত্যেকের বিভিন্ন কারণে অম্বল হয়; সুতরাং নিজে যদি, যে জিনিষ খাইলে অম্বল হয়, তাহা বাদ দিতে পারেন তবেই মঙ্গল। খাদ্যাখাদ্যের কোন্‌টা খাওয়া উচিত কোন্‌টা নয়, তাহার ঠিক কোন নির্দ্দিষ্ট তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। ক্লান্তি না ঘটাইয়া ব্যায়াম, কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইতে না দেওয়া, অত্যধিক ভোজন না করা, খুব বেশী ঘৃত মশলাদি না খাওয়াই মোটামুটি অম্বল কমাই-বার ব্যবস্থা। অত্যধিক অম্বল হইলে চায়ের বাটীর এক বাটী জলে সিকি চামচ গুঁড়া সোডা দিয়া খাইলে অম্বলের উপশম হয়।

প্রাতে গা বমি বমি করা।

গর্ভের প্রথম অবস্থায় শতকরা ৫০ জনের প্রাতে গা বমি বমি করে। গর্ভাধানের পূর্ব্ব লক্ষণের মধ্যে ইহা একটা। সাধারণতঃ গর্ভের ৬ সপ্তাহ হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত এইরূপ গা বমি বমি করে; কাহারও কাহারও বা দুই সপ্তাহে এই উপসর্গ দেখা দেয়। কাহারও বা মাত্র প্রাতে গা বমি বমি করে, কাহারও বা বিশেষভাবে বমি হইয়া থাকে।

যদি বমির জন্য প্রসূতি দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়।

প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা—গর্ভের পূর্ব্বাবস্থায় অনেকেরই কোষ্ঠ-কাঠিন্য দেখা যায়—এই সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। সকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় ধীরে ধীরে মাথা তোলা উচিত। গা বমি বমি বেশী করিলে, বিছানা ছাড়িবার পূর্ব্বে শুকনা মুড়ি বা বিস্কুট খাওয়া উচিত। ঘুম ভাঙ্গিবার পরও আধ ঘণ্টা বিছানায় শুইয়া থাকা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকবার খাওয়ার পর চিত হইয়া অন্ততঃ ১ঘণ্টা শুইয়া থাকা ভাল। পেট একটু খালি রাখিয়াই খাওয়া দরকার। বেশী গা বমি বমি করিলে ৪।৫ দিন মাছ, মাংস, ঘি, মাখন খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। এই সময় তরকারী, অল্প পরিমাণে ভাত, দুধ, মুড়ি, বিস্কুট খাওয়া যাইতে পারে। জল, দুধ, লেমনেড অন্ততঃ রোজ তিন পোয়া খাওয়া দরকার। এইরূপ ভাবে গা বমি বমি করা কমিলে, সাধারণ খাদ্য খাওয়া চলিতে পারে।

যদি ইহাতেও গা বমি বমি করা না কমিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, তবে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া উচিত।

পা ফোলা

সাধারণতঃ গর্ভের শেষ কয় মাসে পায়ের গাঁটের নিকট সামান্য ফুলিয়া থাকে। প্রথম প্রসূতির এইরূপ ফোলা বিশেষ অস্বাভাবিক নহে। সমানভাবে শয়ন করিলে, বা পা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিলে, এইরূপ সামান্য ফোলা কমিয়া যায়,—প্রসবের পর ফোলা আর থাকেনা। কিন্তু, যদি পায়ের চেটো ও উপরের পা পর্যান্ত ফুলিয়া যায়, তবে হৃৎপিণ্ড কিংবা কিডনির রোগ থাকার সম্ভাবনা। যদি হাত, মুখ ও চোখের কোল ফুলিয়া যায়, তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা অবিলম্বে করান একান্ত আবশ্যক।

শির ফুলিয়া উঠা

অনেক সময় পায়ের শির ফুলিয়া উঠিয়া যন্ত্রণাদায়ক হয়। যাঁহারা অনেকগুলি সন্তান প্রসব করিয়াছেন,—বিশেষতঃ যাঁহারা আঁট জামা কাপড় পরিয়া থাকেন, তাঁহাদের এইরূপ শির ফুলিতে প্রায়ই দেখা যায়। মাটীতে শুইয়া দেওয়ালে পা উঁচু করিয়া রোজ ১০ মিনিটকাল রাখিলে এইরূপ শির ফোলা অনেকটা কমিয়া যায়। যদি শির ফুলিয়া বিশেষ কষ্টদায়ক

হয়, তবে ৪ আঙ্গুল চওড়া ও ৬ হাত লম্বা পটি পায়ে বাঁধিলে কষ্ট কম হইতে পারে। রাত্রে শুইবার সময় পটি খুলিয়া রাখিতে হয়। পটি পায়ের নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উপর পর্য্যন্ত বাঁধিতে হয়। পা উঁচু করিয়া শুইয়া থাকিলে এইরূপ পা-ফোলার অনেক উপশম হয়। গর্ভের সময় আঁট জামাকাপড় পরিধান করা অন্যায়।

হাঁপ ধরা

পেট বড় হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়াতে, গর্ভের কয়মাস অল্প পরিশ্রমেতেই হাঁপ ধরিয়া থাকে। যদি হাত বা পা না ফুলিয়া থাকে, বা অন্য কোন উপসর্গ না থাকে, তবে এই প্রকার হাঁফ ধরা কোন রোগের লক্ষণ নহে। কিন্তু যদি হাত পা ফোলা থাকে, কিংবা শুইয়া থাকিলেও যদি হাঁফ ধরে, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকার রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে।

খাল ধরা

উদরস্থ সন্তান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্নায়ু ও ধমনীর উপর চাপ পড়াতে, অনেক সময় পায়ে খাল ধরে। সেই সময় শুইয়া, পা উঁচু করিয়া, পায়ের পাতা নাড়া চাড়া করিলে, বা পায়ের গুলি মালিস করিয়া দিলে উপশম হয়। প্রথম গর্ভের সময়ে খাল ধরা কিঞ্চিৎ অধিক অনুভূত হয়। প্রসবের পর এই উপসর্গ আর থাকে না।

নিদ্রা-হীনতা

গর্ভের শেষ তিন মাস নিদ্রাহীনতা কষ্টদায়ক হইতে পারে। একটু পরিশ্রম করিলে, বেড়াইয়া বেড়াইলে, এবং বৈকালে ও রাত্রে চা খাওয়া (যাঁহারা এ অভ্যাস পূর্ব্বেই ছাড়েন নাই) বন্ধ করিয়া দিলে, নিদ্রাহীনতার উপশম হয়। নিদ্রাহীনতার জন্য কোন ঔষধ, ডাক্তার না দেখাইয়া খাওয়া উচিত নহে। নিদ্রার পূর্ব্বে শরীরের সমস্ত অঙ্গ শিথিল করিয়া শুইয়া বই পড়িলে, কিংবা ৫০০ অবধি গুণিলে ও ঘর নীরব থাকিলে নিদ্রাহীনতা অনেক সময় দূর হয়।

চুলকানি।

চুলকানি একটি বিরক্তিকর উপসর্গ। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে গরম জলে সোডা ফেলিয়া, সেই জলে, যেখানে যেখানে চুলকানি হইয়াছে, ধূইলে চুলকানি কম থাকে। গবাঘৃতে নিমপাতা ভাজিয়া সেই ঘৃত যেখানে চুলকানি হইয়াছে লাগাইলে উহা কম হইয়া যায়। যদি চুলকানি স্রাবের সংস্পর্শ দোষে হয়, তবে চিকিৎসক দ্বারা ব্যবস্থা করান উচিত।

অন্যান্য চর্ম্মরোগ

দাদ, পাঁচড়া, খোস, এক্সিমা, কুষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত প্রকার চর্ম্মরোগই বীজাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়; কিন্তু প্রত্যেক চর্ম্মরোগের বীজাণু বিভিন্ন। কাপড়, গামছা, বিছানা বা রুগীর ছোঁয়াচে এই সমস্ত চর্ম্মরোগ একজনের নিকট হইতে অপরের হইয়া থাকে। জলের ভিতর দিয়াও এই বীজাণু একস্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয়। চর্ম্মরোগগ্রস্থ রুগীর ছোঁয়াচ হইতে পৃথক থাকাই চর্ম্মরোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়।

সকল প্রকার চর্ম্মরোগই বিরক্তিকর এবং কষ্টদায়ক এবং অল্পে প্রতিকার না করিলে শরীরের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

বেশ ভাল করিয়া প্রত্যহ ৩ বার গরম জল ও সাবান (কার্ব্বলিক) বা নিম পাতা সিদ্ধ গরম জলে ধোওয়াই প্রত্যেক প্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ; এই প্রকারে প্রত্যহ ২।৩ বার ধুইলে চর্ম্মরোগ শীঘ্র সারিয়া যায়, এবং কষ্টেরও লাঘব হয়। কুষ্ঠ-ব্যাধির চিকিৎসা আছে এবং সন্দেহ হইলেই সময় নষ্ট না করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি সাধারণ চর্ম্মরোগগুলি ধুইবার পর—

বোরিক এ্যাসিড—৩০ গ্রেণ
রিসরসিন—৩ গ্রেণ
সালফার প্রেসিপিটেট্—৩০ গ্রেণ
জিঙ্ক অক্সাইড—৩০ গ্রেণ
সোডা স্যালিসিলাস—১০ গ্রেণ
ষ্টার্চ—½ আউন্স

একত্রে নারিকেল তৈলের সহিত মিশাইয়া মলম করিয়া লাগাইলে সারিয়া যায়। ঘামাচি বা চুলকানিতে বোরিক এ্যাসিড ১ ড্রাম ও মেন্থল ১ গ্রেণ মিশাইয়া লাগাইলে কষ্টের

লাঘব হয়। নিমপাতা, হরিদ্রা, সর্ষপ তৈল একত্রে মিশাইয়া মালিস করা সাধারণ চর্ম্মরোগের বেশ ভাল ব্যবস্থা, কিন্তু পরিষ্কার থাকা ও প্রত্যহ ২।৩ বার ধোয়া চর্ম্মরোগ সারাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ক্রাইসোফ্যানিক এ্যাসিড নারিকেল তৈলের সহিত মলমের মত করিয়া দাদের উপর মালিস করিয়া দিলে দাদ শীঘ্রই ভাল হইয়া যায়।

মাথা ধরা

শেলাই করার সময়, পড়িবার সময় বা কোন প্রকার শিল্প কর্ম্ম করিবার সময় চোখের দোষ থাকিলে অনেক সময় মাথা ধরে; চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া চসমা পরিলেই এইরূপ মাথা ধরা সারিয়া যায়। অনেক সময় গর্ভাবস্থায়, সামান্য চোখের দোষেও মাথা ধরে—প্রসবের পর সারিয়া যায়। কোষ্ঠ-কাঠিণ্যের জন্যও মাথা ধরে, মাথা ধরা কষ্ট দায়ক হইলে এবং কিছুদিন স্থায়ী হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা উচিত, এবং কিড্নির দোষ আছে কি না তাহা ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত। কিড্নির দোষ থাকিলে "এলবিউমিন" জাতীয় পদার্থ প্রস্রাবের সহিত বাহির হয়; সাধারণ সুস্থ অবস্থায় প্রস্রাবে

এলবিউমিন থাকে না ; প্রস্রাব পরীক্ষা করাইলেই এই দোষ ধরা পড়িয়া যায়। প্রস্রাবে এলবিউমিন থাকিলে প্রোটিনবহুল উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য খুব কম, বা না খাওয়াই উচিত। জল ও জলীয় পদার্থ অধিক খাইতে হয়।

প্রস্রাবে এলবিউমিন এবং গর্ভাবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়া

গর্ভের ছয় মাসের সময় একবার প্রস্রাব একজামিন করান উচিত। যদি প্রস্রাবে "এলবিউমিন" থাকে, তবে চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে গর্ভাবস্থাতেও এলবিউমিন প্রস্রাবে থাকে না ; প্রস্রাবে এলবিউমিন থাকিলে কিড্‌নির কোন প্রকার রোগ হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যদি প্রস্রাবে এলবিউমিন পাওয়া যায়, তবে বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসার প্রয়োজন ; কারণ প্রস্রাবে এলবিউমিনই

একল্যাম্পাসিয়ার

বা গর্ভাবস্থায় ফিট হওয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ। গর্ভাবস্থায় ফিট হওয়া, হাত-পা ও মুখ ফোলা, প্রস্রাবে এলবিউমিন, বমি, মাথা ঘোরা, উপরের পেটে ব্যথা, চোখে কম দেখা, চোখের সামনে আলোক ঝলসান কিংবা দাগ দেখা, প্রস্রাব পরিমাণে কম হওয়া,

একল্যাম্পসিয়ার লক্ষণ। ইহা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া পড়ে। যদি প্রস্রাবে এলবিউমিন দেখা যায়, অথচ হাত-পা ফোলা না থাকে, কিংবা একল্যাম্পসিয়ার লক্ষণ ফুটিয়া না ওঠে, তাহা হইলেও ডাক্তার দেখান উচিত। যতদিন না প্রস্রাব হইতে এলবিউমিন চলিয়া যায়, ততদিন নিম্নলিখিত ব্যবস্থা মতে চলা কর্ত্তব্য—

(১) কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার রাখা দরকার, এমন কি কোষ্ঠ তরল হইলেই ভাল।

(২) জল অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত।

(৩) আহারের পরিমাণ কম করা কর্ত্তব্য—মাছ, মাংস একেবারে নিষিদ্ধ; জল, অল্প পরিমাণে দুধ, ফল, তরকারী, সামান্য রুটী, খাওয়া দরকার। প্রোটীন-প্রধান-উপাদান-বহুল পদার্থ খুবই কম খাওয়া উচিত।

বিছানায় শুইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ঠাণ্ডা লাগান বা বেশী জল ঘাঁটা উচিত নহে।

যদি প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে এলবিউমিন থাকে, তবে ডাক্তারের নিকট ব্যবস্থা লওয়া একান্ত আবশ্যক এবং নিম্নলিখিত বিধিগুলি পালন করা উচিত—

(১) বিছানায় শুইয়া থাকা উচিত।

(২) জল, সোডা, লেমনেড বেশী পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক।

(৩) কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার।

(৪) জলীয় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু খাওয়া উচিত নহে, এবং খাদ্যেও প্রোটীন-প্রধান-উপাদান-বহুল খাদ্যের পরিমাণ একেবারেই কম করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে এই রোগ খুব বেশী দেখা যায় না; তাহা হইলেও এ বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। পল্লীগ্রামে এই প্রকার রোগ হইলে প্রায় ভূতে পাইয়াছে ধরিয়া লওয়া হয় এবং চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

যদি একল্যাম্পসিয়া হইয়া পড়ে তবে হাঁসপাতালে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে বা গরীবের ঘরে ইহার চিকিৎসা সম্ভবপর নহে।

মূত্র-কৃচ্ছ্রতা বা প্রস্রাবের কষ্ট

গর্ভের প্রথম ২।৩ সপ্তাহ ও গর্ভের শেষ কয়েক সপ্তাহ প্রস্রাবের ইচ্ছা বাড়িয়া যায়;—ইহা স্বাভাবিক এবং কোনপ্রকার

উদ্বেগের কারণ নহে। প্রস্রাবের সময় যন্ত্রণা বা কষ্ট, মূত্রাশয় ও মূত্রকোষের রোগের দরুণও হইতে পারে। যদি কিডনি বা মূত্রগ্রন্থিঘটিত রোগের জন্য প্রস্রাবের কোন উপসর্গ হয়, তবে কোমরে বেদনা থাকে, প্রস্রাবে এল্‌বিউমিন থাকে, মাথা ধরে ও জ্বর হয়। প্রস্রাবের সহিত যদি কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে, তবে চিকিৎসক দেখানই উচিত। প্রস্রাবের কোন প্রকার কষ্ট হইলে অধিক পরিমাণে জল খাওয়া উচিত। সাদা পুনর্ণবাসিদ্ধ জল খাইলে প্রস্রাবের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

স্রাব।

রক্তস্রাব।—গর্ভাধানের পর কোন প্রকার লাল স্রাব, বিশেষতঃ রক্তস্রাব হইলে কালবিলম্ব না করিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকের গর্ভাধান হইলেও ঋতুস্রাবের মত অল্প পরিমাণে স্রাব হইতে পারে, কিন্তু রক্তস্রাব হইলেই শুইয়া থাকা উচিত এবং সমস্ত প্রকার শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনা বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি স্রাবের সঙ্গে কোমরে কোন প্রকার বেদনা থাকে, তাহা হইলে এই রক্তস্রাব আশু গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ। এইরূপ স্রাব হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ অবিলম্বে লওয়া উচিত।

হল্‌দে রংয়ের স্রাব।

অল্প পরিমাণে সাদা রং এর স্রাব অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যদি হল্‌দে বা হলুদাভ সবুজ রংয়ের স্রাব হয়, তবে ডাক্তারের নিকট পরামর্শ লওয়া উচিত, এবং প্রসবের পূর্ব্বেই এই প্রকার স্রাব সারাইয়া লওয়া দরকার, কারণ, এই স্রাব প্রসবের সময় থাকিয়া গেলে, শিশুর চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এবং প্রসূতিরও জ্বর হইতে পারে। মেহরোগ এইপ্রকার স্রাবের একটী প্রধান কারণ।

পাঁশুটে রংয়ের স্রাব

যদি পাঁশুটে রংয়ের স্রাব হইতে থাকে, তবে গর্ভস্থ সন্তানের নাশ হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তান-নাশই হইয়া থাকে, তবে পেট বাড়া কমিয়া যাইবে ও সন্তানের নড়া চড়া আর অনুভূত হইবে না।

উপদংশ ও মেহ।

উপদংশ ও মেহ এই দুইটী রোগই বিশেষ ভয়াবহ; (১) সিফিলিস্, উপদংশ, গরমী বা পারা বা পারদ রোগ; (২) গণোরিয়া, মেহ, প্রমেহ, বা ঔপসর্গিক মেহ। এই দুইটী রোগ আমাদের দেশে সাধারণতঃ "কুৎসিৎ রোগ" বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে। অসৎচরিত্র স্ত্রীলোকের সহিত সহবাসেই এই সমস্ত রোগ পুরুষশরীরে প্রবেশ করে এবং, পুরুষ-সহবাসেই স্ত্রীলোকের শরীরে প্রবেশ করে; অতি সূক্ষ্ম বীজাণু দ্বারা এই রোগগুলির সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং একের শরীর হইতে অপরের শরীরে এই বীজাণু পরিচালিত হইয়া রোগের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই প্রকারে স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রী রুগ্না হন; এবং পিতা কিংবা মাতার এই রোগ থাকিলে সন্তান মৃত, বিকলাঙ্গ বা রুগ্ন হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রসূতির প্রায়ই গর্ভপাত হইয়া থাকে, কিংবা মৃত বা বিকলাঙ্গ সন্তান হইয়া থাকে; এ ক্ষেত্রে পিতা মাতা পারদ-রোগ-দুষ্ট হওয়াই সম্ভব, এবং রক্ত পরীক্ষা করাইয়া দেখা কর্ত্তব্য তাঁহাদের পারদ বা উপদংশ আছে কিনা। যাঁহারা মৃত সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে "মড়ুঞ্চে পোয়াতী বা মৃতবৎসা"

বলা হইয়া থাকে, আবার এরূপও দেখা যায় যে প্রসূতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে এবং পুঁজ পড়িতে থাকে ; প্রসূতিও হলুদাভ সবুজ রংএর স্রাবে কষ্ট পান ; গণোরিয়া বা মেহ এই সমস্ত উপসর্গের প্রধান কারণ। তলপেটে বেদনা, প্রস্রাবের সময় যন্ত্রণা, অধিক ঋতুস্রাব, সমস্ত সময়েই দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, ক্ষত বা ঘা, সর্ব্বসময়েই শারীরিক অসুস্থতা, বন্ধ্যাত্ব, বা পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত ও সন্তানের চক্ষু পীড়া, এই সমস্ত উপসর্গগুলি কুৎসিৎ রোগ দ্বারা সৃষ্টি হয়।

এই রোগগুলি যে কুৎসিৎ রোগ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কুৎসিৎ রোগ বলিয়াই যে ইহাদের চিকিৎসা না করাইয়া গোপনে রাখিতে হইবে ইহাও অত্যন্ত অন্যায়। যাঁহাদের সিফিলিস্ বা গণোরিয়ার মধ্যে কোনটীর একটী ব্যাধি হইয়াছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, যে যতদিন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া না যান, ততদিন সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন, যাহাতে স্ত্রীর এই ব্যাধি না হইয়া পড়ে ; যদি কোন প্রকার অসাবধানতাবশতঃ স্ত্রীরও এই ব্যাধি হইয়া পড়ে তবে উভয়েরই চিকিৎসা করান আবশ্যক। আমাদের দেশে অনেক সময় এইরূপ হইয়া থাকে যে, স্বামী গোপনে নিজের রোগের চিকিৎসা করাইয়া প্রায় সারিয়া যান ;

কিন্তু স্ত্রীর চিকিৎসা না করানর কারণ পুনরায় নিজে ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়েন; স্ত্রীকে এইরূপে রোগের আড়ৎ করিয়া রাখার ফলে, পিতা মাতা ও শিশুসন্তান সকলকেই ইহার ফলভোগ করিতে হয়। অজ্ঞতা ও মূর্খতাই ইহার জন্য দায়ী; যখন দুইটী রোগই উপযুক্ত চিকিৎসার অধীনে ভাল হইয়া থাকে, তখন ইহাদিগকে গোপনে শরীরের মধ্যে পোষণ করিয়া স্ত্রী বা পুত্রকন্যাকে ব্যাধিগ্রস্থ করিবার অপর কারণ কি হইতে পারে?

কোন চিকিৎসকই তাঁহার রোগীর সম্বন্ধে অপরের সহিত আলোচনা করেন না, কারণ ইহা অনুচিত ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ। স্বামীর রোগ সম্বন্ধে অপরের সহিত গল্পালাপ বা আলোচনা করাও স্ত্রীধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; সুতরাং কোন রোগ হইলে স্ত্রীর নিকট গোপন না করিয়া চিকিৎসা করান স্বামীর কর্ত্তব্য এবং নিজের ও স্বামীর শরীর সুস্থ, সবল রাখাই প্রত্যেক নারীরও ধর্ম্ম। এ বিষয় সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে কুৎসিৎ রোগের প্রভাব কমিয়া যাইবে, এবং সময় মত চিকিৎসিত হইলে অনেকে রোগ ভোগও কম করিবেন; সন্তান সন্ততিও এই সমস্ত কুৎসিৎ ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাইবে।

ম্যালেরিয়া

বাংলা দেশে আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কিছু না কিছু ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকেন। বাংলা দেশে প্রত্যহ ১০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে ; ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া আমরা যে প্রায় সকলেই হীন-বল হইয়া পড়িতেছি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়া দেশ হইতে তাড়ান বহু-ব্যয় এবং গভর্ণমেণ্ট ও সকলের সম্মিলিত চেষ্টা সাপেক্ষ, কিন্তু দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়ান সম্ভবপর ; পৃথিবীর অনেক ম্যালেরিয়াগ্রস্থ দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইয়াছে এবং তত্রদেশীয় অধিবাসীগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার ভোগ কম করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে এবং তাহা বিশেষ ব্যয়ের উপর নির্ভর করে না। ম্যালেরিয়ার এক প্রকার বীজাণু আছে ; ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীকে কামড়াইয়া মশা এই বীজাণু-মিশ্রিত রক্ত শোষণ করে এবং সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়াইয়া এই বীজাণু তাহার শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয় ; এই প্রকারে ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি হইতে থাকে। বর্ষা কালেই মশা ডিম পাড়ে এবং বংশ-বৃদ্ধি করিতে থাকে, সুতরাং এই সময়েই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়।

যেখানে জল জমিয়া থাকে এবং জল চলাচল হয় না, এইরূপ নালা, খানা, ডোবা বা পতিত হাঁড়ীর জলের উপর মশা ডিম পাড়ে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে বন্যা আসিয়া থাকে, সেখানে জল চলাচল হয় বলিয়া মশার ডিম হইতে মশা ফোটে না, এবং মশক বংশ নাশ হইয়া যায় ; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সমস্ত স্থানেই মশার ডিম অবাধে ফুটিতে পারে ও মশক বংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এইজন্য পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে এত অধিক। পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে মশক বংশ বৃদ্ধি হইবার সুবিধা নাই, সেখানে ম্যালেরিয়া নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সমস্ত দেশ পূর্ব্বে বর্ষায় ধুইয়া যাইত সেখানে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না, এখন ধুইয়া যায় না বলিয়া ম্যালেরিয়া সেখানে ভীষণভাবে হইয়াছে। মনুষ্য শরীরে "কুইনাইন"ই ম্যালেরিয়ার বীজাণু নষ্ট করিবার একমাত্র ঔষধ। সুতরাং ম্যালেরিয়া হইতে নিস্তার পাইতে মশক বংশের নাশ ও বৃদ্ধি বন্ধ করা, মশক দংশন হইতে নিজেকে রক্ষা করা; এবং কুইনাইন সেবন করিয়া মনুষ্য শরীরের ম্যালেরিয়ার বীজাণু নষ্ট করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

বাসস্থানের চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার রাখা, ডোবা

পরিষ্কার রাখা, ত্যক্ত হাঁড়ী গামলা প্রভৃতিতে জল থাকিতে না দেওয়াই সর্ব্ব-সময়ে কর্ত্তব্য। অব্যবহার্য্য ডোবাগুলি ভর্ত্তি করিয়া ফেলিতে না পারিলে তাহা পরিষ্কার রাখিয়া মাছের চাষ করাই উচিত। কেরোসিন ছড়াইয়া দিলেও মশক ডিম পাড়িতে পারে না। মশারির ভিতর শুইলে মশার কামড় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; বাড়ী, ঘর পরিষ্কার রাখিয়া সন্ধ্যার সময় ধুনা দিলে মশা কম হয়। মনুষ্য শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজাণু নষ্ট করিতে হইলে, অন্ততঃ ৫ গ্রেণ করিয়া কুইনাইনের বড়ি সপ্তাহে দুইবার খাওয়া উচিত। চিনি দিয়া ঢাকা কুইনাইনের বড়ি ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়, তাহা না হইলে হজম হয় না এবং কাজে লাগে না; কুইনাইন খাইবার পর একটু লেবুর রস খাওয়া আবশ্যক। দুগ্ধ খাইলে কুইনাইন খাওয়ার দরুণ কষ্ট কম হয়। ম্যালেরিয়ার সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে অনেকে কুইনাইনের পক্ষপাতী নহেন—তাহার কারণ, ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন খাইলেও অনেকের জ্বর হয়, কুইনাইন খাইয়া বেশী পরিমাণ দুগ্ধ না খাইলে কষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং "কুইনাইন" যে অপকারী পদার্থ ইহাই তাঁহাদের ধারণা! ম্যালেরিয়ার কিংবা বর্ষার সময় আমরা মশকদ্বারা সর্ব্বসময়েই দংশিত হইয়া থাকি, এবং

ম্যালেরিয়ার বীজ শরীরে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে থাকে; সুতরাং এই বীজাণু ধ্বংস করিতে হইলে সর্ব্ব সময়েই কুইনাইন রক্তের মধ্যে থাকা আবশ্যক, এই জন্য অন্ততঃ ৫ গ্রেণ কুইনাইন সপ্তাহে দুইবার খাইতে হয় এবং নিজেকে মশার দংশন হইতে রক্ষা করিতে হয়। অনেকের ধারণা আছে যে কুইনাইন অধিক দিন খাইলে শরীরের হানি হয়, সুতরাং মধ্যে মধ্যে বন্ধ দিয়া থাকেন; কিন্তু ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন বন্ধ দিলেই জ্বর হইবে; কারণ বন্ধ দিলে রক্তে কুইনাইন থাকে না, এবং ম্যালেরিয়ার বীজ মশক দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইলেই জ্বর সৃষ্টি করিবে। কুইনাইন খাইয়া দুধ বেশী পরিমাণে খাইতে পারিলে শরীরের কোন কষ্ট হয় না। ম্যালেরিয়ার জ্বর ভোগ করিলে শরীর যে পরিমাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে, সে তুলনায় কুইনাইন খাওয়ায় হানি অনেক কম:

প্রসূতির পক্ষেও এই একই নিয়ম পালন করিতে হয়। অনেকের ধারণা আছে, কুইনাইন খাইলে গর্ভপাত হইয়া যায়। ৫।৭ গ্রেণ কুইনাইনে গর্ভের কোন হানি হয় না; এককালীন বহু পরিমাণ কুইনাইন খাইলে গর্ভপাত হইলেও হইতে পারে—হইবেই, ইহার কোনও স্থিরতা নাই; কিন্তু এককালীন বহু পরিমাণ কুইনাইন খাইলে দৃষ্টিহীনতা, বধিরতা, মাথার রোগ ও

দারুণ যন্ত্রণা হইবে, ইহার স্থিরতা যথেষ্ট। গর্ভের সময়েও, ম্যালেরিয়া হইলে প্রতিদিন ৩ গ্রেণ করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর ১২ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়া বেশ চলিতে পারে। জ্বর ভোগ করিলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা কুইনাইন খাইয়া গর্ভপাতের অনুপাতে যথেষ্ট অধিক, সুতরাং অল্প মাত্রায় কুইনাইন, ম্যালেরিয়ার সময় প্রসূতির পক্ষে হানি না করিয়া, উপকারই করিয়া থাকে। জ্বরের উত্তাপ অধিকক্ষণ ভোগ করিলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা অধিক হইয়া থাকে।

অন্যান্য প্রকার জ্বর।

কালাজ্বর

কালাজ্বর, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড্ প্রভৃতি জ্বর সর্ব্ব সময়েই সকলের হইতে পারে, গর্ভাবস্থাও এই নিয়মাধীন। যেমন ম্যালেরিয়ার একপ্রকার বীজাণু বা জীবাণু আছে, এবং মশা সেই বীজাণু একজনের শরীর হইতে অপরের শরীরে বহন করিয়া লইয়া যায়; সেইরূপ ছারপোকা কালাজ্বরের বীজাণু বহন করিয়া থাকে বলিয়াই কথিত হয়; সুতরাং

কালাজ্বরগ্রস্থ রোগীকে ছারপোকা কামড়াইয়া সুস্থ লোককে কামড়াইলে, তাহার শরীরে কালাজ্বরের বীজাণু প্রবেশ করিয়া এই জ্বরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই প্রকার জ্বরে ম্যালেরিয়া জ্বরের মতই প্লীহা বড় হইয়া থাকে; জ্বর প্রায়শঃই দিনে দুইবার আসে; রোগী দিন দিন রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মশক যেরূপ মনুষ্যকুলের শত্রু, সেইরূপ ছারপোকাও আমাদের পরম শত্রু। কুইনাইন খাইয়া জ্বর ভাল না হইয়া গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায়ও ইহার চিকিৎসা চলিতে পারে; চিকিৎসা না করাইলে গর্ভপাত প্রভৃতি উপসর্গের সৃষ্টি হয়। কুইনাইন কালাজ্বর ভাল করিতে পারে না, কিন্তু বিশেষ কোন হানিও করে না।

টাইফয়েড্।

টাইফয়েড্ জ্বরও বীজাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়; এই বীজাণু দুগ্ধ, জল ও অন্যান্য পানীয়ের মধ্য দিয়া মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। ইহাকে চলিত ভাষায় বিষমজ্বর বলা হয়। জ্বর প্রায় একুশ দিন ভোগ করিতে হয়—সাধারণতঃ সকালে কিছু কম

থাকে ও বৈকালে জ্বর ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। ম্যালেরিয়ার মত টাইফয়েডের জ্বর হঠাৎ বাড়িয়া ওঠে না, প্রত্যহ ধীরে ধীরে জ্বর বাড়িতে থাকে ও ধীরে ধীরে কমিতে থাকে; রোগী জ্বর-ভোগ-কালের মধ্যে বিজ্বর হয় না। জিহ্বা অপরিষ্কার থাকে কিন্তু প্রায়ই জিহ্বার অগ্রভাগ লাল হয়; জ্বরের পরিমাণের তুলনায় নাড়ীর গতি ধীর হয়; ম্যালেরিয়ায় যেমন জ্বর বেশী হয়, নাড়ীও তদ্রূপ বেগে চলিতে থাকে। বাস্তবিক টাইফয়েড হইলে রোগীর পরিচর্য্যাই বিশেষভাবে আবশ্যকীয়: টাইফয়েড বাড়ীতে একজনের হইলে আর একজনের বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হইবার সম্ভাবনা থাকে; কারণ ইহার বীজাণু রুগী-স্পৃষ্ট চাদর, তোয়ালে বা গামছা হইতে সাধারণের ব্যবহার্য্য জলের মধ্যে যাইবার সুযোগ পাইলেই অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। এইজন্য টাইফয়েড রুগীর বিছানার চাদর প্রভৃতি পুষ্করিণীতে কাচিতে নাই এবং পৃথক কাচাই উচিত, টাইফয়েডের রুগীর নিকট হইতে শিশুদের পৃথক রাখা কর্ত্তব্য এবং রুগীর পরিচর্য্যা করিয়া ঘরের বাহিরে আসিলে কার্ব্বলিক সাবান দ্বারা হাত পা ধুইয়া লওয়া উচিত। রুগীর পরিচর্য্যা ও খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়; জলীয় পদার্থ ও সহজপাচ্য জিনিষ ভিন্ন অন্য কিছুই দেওয়া উচিত নহে, এবং রুগীকে বিছানা হইতে

একেবারে উঠিতে দিতে নাই ; অন্যান্য পরামর্শের জন্য ডাক্তারের মত লওয়া আবশ্যক।

গর্ভাবস্থায় টাইফয়েড হইলে পরিচর্য্যার বিশেষ আবশ্যক হইয়া ওঠে এবং সুচিকিৎসকের অধীনে থাকা কর্ত্তব্য।

ক্ষয়রোগ

ক্ষয়রোগও একপ্রকার বীজাণু বা জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। এই বীজাণু শরীরের যে কোন স্থানে থাকিয়া সেই অংশের ক্ষয় ও স্বাস্থ্যহানি করিতে পারে ; এবং দুর্ব্বলতা, মানসিক ও শারীরিক অবসাদ, পেটের অসুখ, জ্বর, কাশী, সর্দ্দি, এমন কি ক্ষত প্রভৃতি উপসর্গও আনিতে পারে। যখন এই ক্ষয়রোগের বীজাণু (টিউবারকিউলাস জীবাণু) বুকের মধ্যে ফুসফুসের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন থাইসিস্ বা ক্ষয়কাশ রোগের সৃষ্টি করে ; পেটের মধ্যে নাড়ীতে আশ্রয় লইলে গৃহিণী, সুতিকা প্রভৃতির সৃষ্টি করে ; এমন কি হাড়ের মধ্যে আশ্রয় লইলে সেই হাড়টীকে ফোঁপরা ও বলহীন করিয়া দেয়। এই জীবাণু ক্ষয়রুগীর থুথু বা গয়েরের মধ্যে বহু পরিমাণে থাকে এবং তাহারা যেখানে

সেখানে থুথু ফেলিলে এই বীজাণু লোকের পায়ের তলা বা হাওয়ার মধ্য দিয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয় এবং অন্যের শরীরে প্রবেশ করে ; এইজন্য যেখানে সেখানে থুথু বা সিকনি ফেলা অত্যন্ত বদ-অভ্যাস ও গর্হিত কর্ম্ম। এই জীবাণু নিশ্বাসের সহিত সকলেরই শরীরে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে এই বীজাণু শরীরের অনিষ্ট করিতে পারে না, এবং শরীরের মধ্যে কোন অংশে স্থিতি করিতে পায় না ; কিন্তু শরীর বা মন অসুস্থ থাকিলেই ইহারা দুর্ব্বলতার সুযোগ লয়, এবং শরীরের যে অংশে আশ্রয় পায়, স্থান ভেদে তথায় পূর্ব্বকথিত উপসর্গের সৃষ্টি করে। ক্ষয় রোগ হইতে নিস্তার পাইতে হইলে ক্ষয়রোগগ্রস্থ রুগীর থুথু, গয়ের ও উচ্ছিষ্ট হইতে নিজেকে পৃথক রাখিতে হয়, এবং শরীর ও মনের বল যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে সেইরূপ জীবন যাপন করিতে হয়। রৌদ্রই এই বীজাণুর নাশক, অন্য কিছুতে সহজে ইহাদের নাশ হয় না। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে শতকরা ৯০ জনের অধিক লোক পল্লীতে বাস করেন এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ ও বহু অসুবিধাভোগ করিলেও প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস পাইয়া থাকেন ; নতুবা দিন দিন দেশে যেরূপ স্বাস্থ্যহীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে,

এবং সাধারণ লোকের অর্থের অনটন ও অন্যান্য কারণে মানসিক অশান্তির বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে দেশে ক্ষয় রোগ যে ভীষণভাবে করিয়া বাড়িয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। সহরে যাঁহারা প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস পান না, এবং শরীরধারণের উপযোগী আহারাদিরও অভাব অনুভব করেন, বা ভেজাল জিনিষ খাইয়া পরিপাক শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যাধির বৃদ্ধি হইয়া চলিতেছে। মুক্ত বাতাস, প্রচুর রৌদ্র, শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম ইহার মহৌষধ ; কিন্তু অবিলম্বে সুচিকিৎসার অধীনে থাকা কর্ত্তব্য।

যে স্ত্রী বা পুরুষ ক্ষয়রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের বিবাহ করা উচিত নহে ; যাঁহারা বিবাহিত এবং ক্ষয় রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের সন্তান উৎপাদন হইতে বিরত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

ক্ষয়রোগগ্রস্ত প্রসূতির জীবনের পরমায়ু কমিয়া যায় ; গর্ভাধান হইলে এই রোগ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুই সাধারণ পরিণাম দাঁড়ায় ; ইহাদের সন্তানসন্ততিও হীনবল হইয়া থাকে।

কলেরা

কলেরারও এক প্রকার বীজাণু আছে ; এই বীজাণু জল, দুধ, কুলপী বরফ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের সহিত মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে, এবং জলীয় পুরিষ নির্গম, ভেদ-বমী, জল পিপাসা, হাত পায়ে খাল ধরা, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি উপসর্গের সৃষ্টি করে। কলেরার সময় জল, ও দুধ গরম করিয়া খাওয়া উচিত এবং কলেরাগ্রস্থ রুগীর কাপড়, বিছানা ইত্যাদি পুষ্করিণীর জলে কাচা উচিত নহে ; ইহাতে কলেরার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে ও গ্রামে মহামারী আনয়ন করে।

কলেরা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার অধীন থাকা কর্ত্তব্য ; সামান্য পেটের অসুখ করিলে কর্পূর, সোডা ও জোয়ানের জল মিশাইয়া খাইলে উপশম হয়। মহামারীর সময় কলেরার টীকা লইলে সেই বৎসর রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে ; যাঁহারা কলেরা রুগীর সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহাদের কলেরার টীকা লওয়া উচিত এবং রুগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিলেই হাত পা ভাল করিয়া সাবান জলে ধোয়া উচিত। রুগীর ঘরের জন্য অন্য কাপড় রাখা কর্ত্তব্য। কলেরার রুগীকে পৃথক ঘরে

রাখা কর্ত্তব্য এবং যাঁহারা শুশ্রূষা করেন তাঁহারা ব্যতিত অন্য কাহাকেও সেই ঘরে যাতায়াত করিতে দেওয়া অন্যায়। যদি কোন সময় মনের মধ্যে এই রোগের ভয় হয়, তবে কলেরা রুগীর নিকট হইতে পৃথক থাকা কর্ত্তব্য, এবং পেটের অসুখ বা অন্য কোন প্রকার পেটের গোলমাল হইলেই কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসাধীন থাকা কর্ত্তব্য।

আমাশয়

আমাশয় ও পেটের অসুখ বিভিন্ন প্রকার বীজাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়। ইহাতে রক্ত বাহে, আম বাহে, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া থাকে। ইহার বীজাণুও জল বা জলীয় পদার্থের মধ্য দিয়া একের শরীর হইতে অপরের শরীরে যাইয়া থাকে। পানীয় জল গরম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। আমাশয় হইলে পেটের নাড়ীতে ঘা হয়।

আমাশয় হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য এবং ৩০ ফোঁটা ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়া উচিত; ক্যাষ্টর অয়েল অর্দ্ধ চামুচ প্রত্যহ তিনবার। বেশ ভাল ঔষধ এবং ডাক্তারের নিকট ঔষধের ব্যবস্থা

লইলে অতি শীঘ্রই আমাশয় ভাল হইয়া যায়। ইসফ্গুল ভেজানও আমাশয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আমাশয়ে অনেক সময় উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে লিভার বা যকৃতের দোষ জন্মাইতে পারে, সুতরাং এই রোগ সম্পূর্ণ নীরোগ না হওয়া পর্য্যন্ত, চিকিৎসাধীন থাকা উচিত। প্রসূতির পক্ষে পেটের অসুখ মাত্রেই 'অনিষ্ঠজনক, সুতরাং আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বসন্ত।

বসন্ত রোগও বীজাণু হইতে উৎপন্ন হয়। এই বীজাণু জল বা জলীয় পদার্থ, অথবা বসন্ত রোগীর ছোঁয়াচ সম্পর্কে, একের শরীর হইতে অপরের শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এই ছেঁায়াচ হইতে নিজেকে রক্ষা করা উচিত, এবং যাহাতে এই বীজাণু ছড়াইয়া না পড়ে, তাহার জন্য রোগীর বিছানা ইত্যাদি পুকুরে কাচা উচিত নহে। বসন্তের টীকা লইলে বসন্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব; একবার টীকা লইলে প্রায় ২।৩ বৎসর বসন্তবীজের প্রতিষেধক বস্তু শরীরে

থাকে, এবং এই কারণেই বসন্তের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলেও বসন্ত হয় না, বা হইলেও মারাত্মক হইতে পারে না। বসন্তের সময় সকলেরই টীকা লওয়া কর্ত্তব্য; প্রসূতিকে টীকা দেওয়া যাইতে পারে। শিশুকেও ৬ মাস বয়সের পূর্ব্বে টীকা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যের সাধারণ ব্যবস্থা।

শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ ব্যবস্থা আছে, যেগুলি প্রসূতি এবং সকলকারই সর্ব্ব সময়ে আবশ্যকীয়—যথা বিশুদ্ধ পানীয় জল, মুক্ত পরিষ্কার বাতাস, প্রচুর রৌদ্র, উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য, ব্যায়াম, শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম ও মানসিক শান্তি; এই কয়েকটী সম্যকরূপে সকলকেই পাইতে হইলে, রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টার আবশ্যক, এবং এই গুলির উপকারীতা সম্বন্ধে সকলের জ্ঞান থাকাও প্রয়োজনীয়। কোন প্রকার ব্যাধি হইলে তাহার ব্যবস্থা করা, এবং অযথা কালক্ষেপ না করিয়া, উপযুক্ত চিকিৎসাধীন থাকা সকলেরই উচিত। অনেক সময় আমরা অজ্ঞতা ও অলসতার জন্যও কষ্ট পাইয়া থাকি।

পানীয় জল।

প্রায় সমস্ত সহরেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু পল্লীগ্রামবাসীগণ বিশুদ্ধ পানীয় জলাভাবে নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিয়া থাকেন; পুষ্করিণীর বা নদীর জলই পল্লীগ্রামবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কয়েক বৎসর যাবৎ কতকগুলি স্থানে টিউব-ওয়েল বা নলকূপ হইয়াছে। টিউব-ওয়েলের জল প্রায়ই বিশুদ্ধ; কিন্তু প্রায় সমস্ত পুষ্করিণী বা নদীর জল যে অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং পানের অযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে পুষ্করিণীতে, রোগীর কাপড়, বিছানা বা গামছা কাচা হয়, সকলে বাসন পরিষ্কার করেন ও গো-মহিষাদিকে স্নান করান, সেই পুকুরের জলই সকলে পান করিয়া থাকেন; ইহাতে যে কি প্রকার স্বাস্থ্যহানি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই, এবং এই কারণেই কলেরা ইত্যাদি যে গ্রামে প্রবেশ করে, তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়া যায়। সুতরাং বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইতে হইলে পানীয় জলের পৃথক পুষ্করিণী, কূপ বা টিউব-ওয়েল রাখা কর্ত্তব্য। মহামারীর সময় ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া কর্পূর দিয়া খাওয়া উচিত, এবং রোগীর কাপড় বিছানা ইত্যাদি তোলা জলে জলাশয় হইতে দূরে কাচা কর্ত্তব্য।

রুগীর কাপড়, চাদর প্রভৃতি সাবান জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বিশুদ্ধ বাতাস।

মুক্ত পরিষ্কার বাতাস সহরে দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটী বাড়ীর পাশে আর একটী বাড়ী যেন চাপিয়া ধরিয়া আছে, এবং এইরূপ গৃহে দুই বা তিনটী গৃহস্থের সন্তানাদিসহ বাসস্থান। সকলে বাতাস চলাচলের উপযুক্ত জানালাদি পান না, সুতরাং তাঁহাদের বদ্ধ স্থানেই থাকিতে হয়। বাড়ীর বাহির হওয়া, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, খরচ সাপেক্ষ; সুতরাং বাড়ীর মধ্যে তাঁহাদের আবদ্ধ থাকিতে হয়। যদিও বা দুই বা চারিমাসে একবার বাহির হইবার সুবিধা পান, তাহাও থিয়েটার বা বায়স্কোপের বদ্ধ গৃহে; সুতরাং সহরতল্লীতে মুক্ত পরিষ্কার বাতাস, বাংলার নারী সমাজের পক্ষে অতি দুর্মূল্য। যাঁহারা খোলা বাড়ীতে বাস করেন না, তাঁহাদের প্রত্যহ প্রত্যুষে ১ ঘণ্টা ছাতে বেড়াইয়া বেড়ান উচিত এবং মাঠে বেড়াইতে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহারা এ বিষয়ে অন্ততঃ সৌভাগ্যবান। রৌদ্র সম্বন্ধেও

একই কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মুক্ত বাতাস ও রৌদ্র বহু রোগনাশক এবং অনেক রোগের ঔষধ। প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের পক্ষে, মুক্ত বাতাস ও রৌদ্র যে বিশেষ ভাবে আবশ্যক তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য।

খাদ্যদ্রব্য ও আহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশুদ্ধ খাদ্য এখন আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য—উপযুক্ত মূল্য দিলেও পাওয়া যায় না ; ব্যবসায়ীগণ একেবারেই ভাবিয়া দেখেন না যে, ভেজাল জিনিষের দাম কিছু কম করিয়া দিয়া তাঁহারা নিজেদের, সন্তান সন্ততি ও দেশের সকল লোকেরই স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছেন ; যদি সকলের স্বাস্থ্যহানিই হয় ও যদি সকলে অকালে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তাঁহাদের অর্থ কি প্রয়োজনে আসিবে ? স্বাধীন দেশের লোকে, এ বিষয় যথেষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে এবং দেশে ভেজাল বা নিকৃষ্ট জিনিষ একেবারেই চালায় না ; সেখানে পয়সা দিয়া চাহিলেও ভেজাল খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। যতদিন ব্যবসায়ীগণ আশু অতিরিক্ত লাভের মোহ ছাড়িতে পারিবেন না, এবং দেশের ও

নিজেদের স্বাস্থ্য অপেক্ষা কিছু অর্থের মূল্যই অধিক এই ভ্রান্ত ধারণায় থাকিবেন, ততদিন নিজেদের খাদ্যদ্রব্য নিজেরাই উৎপন্ন করিয়া লইবার চেষ্টা ব্যতীত বিশুদ্ধ খাদ্য পাওয়া অসম্ভব। ভেজাল জিনিষ খাওয়া আর পয়সা দিয়া ডিসপেপসিয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও ডায়েবেটিস্ প্রভৃতি খরিদ করা একই কথা। সাধারণতঃ দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, আটা বা ময়দা এই কয়েকটী বস্তুতেই বেশী ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহারা অল্প চেষ্টাতেই প্রায় সমস্ত জিনিষই বিশুদ্ধ পাইতে পারেন। গ্রামস্থ কলুর নিকট যদি সকলে তৈল খরিদ করেন সে অনায়াসেই বিশুদ্ধ তৈল সরবরাহ করিতে পারে। ঘরে আটা ভাঙ্গিয়া লওয়া শক্ত নহে; পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় সকলেই ঘরে যাঁতায় আটা ভাঙ্গিয়া লইয়া থাকেন, এমন কি ধনী গৃহিণীও যাঁতা দিয়া গম ভাঙ্গা কষ্টকর বা অপমানজনক মনে করেন না। বঙ্গদেশে ময়দার প্রচলন কেন যে অধিক, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ময়দা অপেক্ষা আটা বহু উপকারী ও সুস্বাদু। অনেকেই ভেজালময়দা মিশ্রিতঘৃতে ভাজা পরিষ্কার ফুলকা লুচি উপাদেয় মনে করেন; যেখানেই নিমন্ত্রণাদি হয় সেখানেই এইরূপ গরম লুচি না হইলে নিমন্ত্রণ কর্ত্তার অপবাদ করাই প্রথা। নিমন্ত্রণ খাওয়ার পরদিন পেটের গোলমাল হইয়াছে

এইরূপ প্রায়ই শোনা যায়! ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কিন্তু আমরা এইরূপই চলিত প্রথার দাস হইয়া পড়িয়াছি যে অন্য উপায় নাই। ভেজাল ময়দা না খাইয়া ঘরে আটা ভাঙ্গিয়া খাওয়াই যুক্তি সঙ্গত; এবং কষ্টে উপার্জ্জিত পয়সার বিনিময়ে মিশ্রিত ভেজাল দ্রব্য বা বিষ খাওয়া অপেক্ষা না খাওয়াও বহু যুক্তিপূর্ণ।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও গোপালন।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা অনায়াসেই গো-পালন করিতে পারেন, এবং প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত পাইতে পারেন। পল্লীগ্রামে দুধের জন্য গো, ছাগল ও মহিষ পালন বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ নহে। পশু-পালন পরিশ্রম ও যত্নের কাজ। বাংলাদেশে, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে, মানুষ ও পশু উভয়ই অল্পায়ু ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুজাতির গাভী ভগবতী-তুল্যা; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ভগবতী ও গাভী উভয়েরই দুর্দ্দশার সীমা নাই। যে সমস্ত দেশে গোমাংস প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয়, তাহারাও ভাল মাংস ও দুধের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া গোপালন করিয়া থাকে, এবং খুব ভাল মাংস ও দুগ্ধ

প্রচুর উৎপন্ন করে। আমাদের দেশে ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা! ভগবতী হইলেও গাভীকুলের ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই; পল্লীগ্রামে হৃষ্টপুষ্ট গাভী প্রায় দেখাই যায় না; তাহার কারণ, গাভীর যত্ন নাই এবং তাহারা উপযুক্ত আহারও পায় না। পশ্চিম অঞ্চলে গো-মহিষাদির আহারের জন্য ভুট্টা, জোনারী প্রভৃতি উৎপন্ন করা হয়; প্রত্যেক গৃহস্থই পশু সেবা করে এবং বিনিময়ে প্রচুর ভাল দুগ্ধ ও ঘৃত পাইয়া থাকে। বাংলাদেশে পশু সেবা ও অধিক পরিমাণে ভাল দুগ্ধ পাইবার ব্যবস্থা প্রত্যেক গৃহস্থের করা কর্ত্তব্য। বাসস্থানের একটু দূরে পরিষ্কার গোশালা রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক নহে, কিন্তু গোশালা ও পশুগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। "গোয়ালঘর" আমাদের দেশে অপরিচ্ছন্নতার উপমা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দুগ্ধ ও ঘৃত আমাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান, সুতরাং গোজাতির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। সন্তানের পক্ষে দুগ্ধই প্রধান খাদ্য; প্রসূতিকেও সর্ব্বাবস্থায় অধিক পরিমাণে দুগ্ধ খাইতে দেওয়া উচিত; সুতরাং গোপালন ভাল করিয়া না করিলে এবং গোজাতির উন্নতি সাধন না করিলে এই দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে?

সহরে পশু পালন সম্ভবপর নহে, কারণ তাহাদের নিজেদেরই উপযুক্ত বাসস্থানের যথেষ্ট অভাব; খাদ্যের ত কথাই নাই। কিন্তু যদি পল্লীগ্রামে পশুজাতির উন্নতি সাধন করা হয় এবং গো মহিষাদি পালন যথাযথভাবে হয় তবে সহরেও দুগ্ধ সরবরাহ হইবে।

এসব সময়

প্রসবের সময় পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে সুতরাং তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।

সময় থাকিতেই ডাক্তার কিংবা ধাই নিযুক্ত রাখা ভাল; নতুবা সময়ে কাহাকেও পাওয়া যায় না এবং বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া ওঠে।

২৮০ দিন সন্তান বহন করিয়া প্রসূতির স্বাস্থ্য হীনবল হইয়া পড়ে। প্রসবের সময় রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাতেও প্রসূতিকে সাময়িক ভাবে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। ফলে, যদি কোন প্রকার বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে, তাহারা প্রসূতির নানা প্রকার রোগ আনয়ন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটাইতে পারে। ধাত্রী বা আত্মীয়গণের অজ্ঞতা বশতঃ এই সময় বীজাণু প্রবেশের কোন বাধা থাকে না এবং প্রসূতিকে নানা প্রকার রোগ ভোগ করিতে হয়। প্রসবের সময় যাহাতে কোন প্রকার বীজাণু শরীরে প্রবেশের সুবিধা না পায়, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকা উচিত; অপরিষ্কার ঘর, ময়লা জামা কাপড় বা বিছানা, ধাত্রীর ময়লা হাত, অপরিষ্কার জল, এই সমস্ত হইতেই বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে; এই বীজাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে

সাধারণ চোখে দেখা যায় না—অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ৫০০।১০০০ গুণ বড় করিয়া তবে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যে কত জননী এইরূপ বীজাণু-জনিত ব্যাধিতে সূতিকাঘরেই মারা যাইতেছেন তাহার হিসাব নিকাশ নাই ; এমন কি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেও, প্রসবের পর প্রায়ই দেখা যায় যে জননী চিররুগ্না হইয়া পড়িয়াছেন এবং সাংসারিক কার্য্যের ভার বহন করিতে কিংবা সন্তান পালনের পরিশ্রম করিতে একেবারেই অক্ষমা হইয়াছেন। ফলে, কর্ত্তব্যবোধ থাকিলেও, স্বাস্থ্য অভাবে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়, নিজের জীবনকে দুর্ব্বহ মনে করেন,—আত্মীয়েরাও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে এইরূপ ভাবে চিররুগ্না করিবার জন্য তাঁহারা অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা অসাবধানতার কারণেই হউক, নিজেরাই দায়ী ; সুতরাং যাহাতে প্রসবের সময় কোন প্রকার বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য।

প্রসবের সময় প্রসূতির বিশেষ কষ্ট হয় ; তাহার পূর্ব্বে ২৮০ দিন সন্তান বহন করিয়া ও তাহার আহার যোগাইবার দরুণ মাতার শরীরের উপর বেশ "ধকল" পড়ে ; যে রক্তস্রাব হয়,

তাহাতেও প্রসূতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। অনেক সময় এই রক্তস্রাবের মাত্রা এত অধিক পরিমাণে হয় যে তাহাতে প্রসূতিকে বিশেষভাবে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং বীজাণু-জনিত ব্যাধিগুলি প্রসূতির মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অপরিষ্কার আঁতুড়ঘর, ময়লা কাপড় চোপড়, ধাত্রীর অপরিষ্কার হাত হইতেই এই সমস্ত বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে সুতরাং ইহার ব্যবস্থা আবশ্যক।

আঁতুড়ঘর

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে, কোনরকমভাবে এক-পাশে ঘিরিয়া বা পরিত্যক্ত গৃহে আঁতুড়ঘর হইয়া থাকে। আঁতুড়ঘর পরিষ্কার, শুকনা হইবে, এবং আলো, রৌদ্র ও হাওয়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া একান্ত আবশ্যক। ঠাকুরঘর যেরূপ শুদ্ধাচারে পরিষ্কার রাখা হয়, যে ঘরে নরনারায়ণের আবির্ভাব হয়, সেই আঁতুড়ঘরও সেইরূপ পরিষ্কার ও শুদ্ধাচারসম্মত হওয়া উচিত; উপরন্তু ইহাতে হাওয়া ও রৌদ্রের চলাচল হওয়া

দরকার। যে ঘরে হাওয়া ও রৌদ্রের প্রবেশ হয়, তাহাতে বীজাণুর বৃদ্ধি হয় না এবং রৌদ্রে অনেক বীজাণুর নাশও হয়। ঘর বেশ পরিষ্কার থাকিলে প্রসূতির মনও প্রফুল্ল থাকে এবং তাঁহার শরীরও শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ওঠে। আমাদের দেশে আঁতুড়ঘরে অন্যান্য জিনিষপত্র রাখা হয় না—থাকিলে তাহা অশুচি হইয়া যায়; এই প্রথা ভালই—ইহাতে আঁতুড়ঘরও পরিষ্কার থাকে এবং আঁতুড়ের বীজাণু অন্যান্য জিনিষপত্রের ভিতর দিয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে না।

আঁতুড়ঘর বাড়ীর একপাশেই হওয়া ভাল; কারণ একপেশে ঘরগুলি কোলাহলশূন্য হয়। বেশী কোলাহলে প্রসূতির ও সন্তানের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে; অথচ এই সময়ে বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক।

আঁতুড়ঘরে প্রসূতির শয়নের জন্য বিছানা দেওয়া উচিত; ছেঁড়া ময়লা কাঁথা কিংবা ছিন্ন মাদুরে, সেঁতসেঁতে ঘরে কাহারও সুনিদ্রা সম্ভব নহে, কিংবা দুর্ব্বল শরীর সবল করাও সম্ভব নহে। বিছানা পরিষ্কার হওয়াই উচিত। আমাদের দেশে অনেকে আঁতুড়ের বিছানা পৃথক করিয়া রাখিয়া দেন এবং আঁতুড়ঘরে

সেই বিছানাই ব্যবহার করেন। যদি ভাল করিয়া বিছানা রাখা থাকে তবে আঁতুড়ের বিছানা পৃথক রাখা অযুক্তিপূর্ণ নহে, কিন্তু আঁতুড় উঠিয়া গেলে বিছানাকে ১০।১২ দিন ধরিয়া রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া রাখা উচিত এবং আবশ্যক।

আঁতুড়ঘরে যে কাপড়, চাদর বা কাঁথা ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয় কার্ব্বলিক এসিডের জল (১ চামচ কার্ব্বলিক এসিডে ১ কোয়ার্ট পরিমাণ জল) দিয়া ভিজাইয়া শুকাইয়া লওয়া উচিত, এবং সেই জলদ্বারা ঘরও ধুইয়া ফেলা উচিত।

প্রসূতির জন্য একখানি চৌকী দিতে পারিলেই ভাল হয়।

ধাত্রী বা যে আত্মীয় প্রসবের সময় ঘরে থাকেন ও প্রসব করান, তাঁহার হাত পরিষ্কার হওয়া দরকার। ঘরের বাহিরে সাবান দিয়া হাত পা ধুইয়া, নিজের কাপড় ছাড়িয়া, আঁতুড়ঘরের জন্য পরিষ্কার কাপড় যাহা রাখা আছে তাহাই পরিধান করা উচিত ; তাহা না হইলে তাহাদের ময়লা কাপড়ে বাহিরের যত বীজাণু ঘরে প্রবেশ করে।

আঁতুড়ঘরের আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র

প্রসূতির জন্য

(১) ২ খানা ম্যাকিনটস, ৪ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া, কিংবা অয়েলক্লথ, কিংবা একখানি মাদুর ও দুইখানি চাদর বা নেকড়া, ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া।

(২) দুই প্যাকেট তুলা—গাছের কাপাস তুলাও চলিতে পারে, কিন্তু তাহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া পরে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লইয়া নূতন মাটীর হাঁড়ী শুকনা গরম করিয়া তাহাতে সরা চাপা দিয়া রাখিয়া দেওয়া দরকার।

(৩) ষ্টেরাইল বোরিক গজ, কিংবা একখানি ফরসা পুরাণো কাপড় গরম জলে কার্ব্বলিক এসিড (১ চামচ ও জল ১ কোয়ার্ট এই পরিমাণ) দিয়া সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লইয়া তুলার সহিত হাঁড়িতে রাখা থাকিলেও চলিতে পারে।

(৪) লাইসল—½ পাউণ্ড, কিংবা কার্ব্বলিক এসিড কিংবা ১ আউন্স টিনচার আইডিন।

(৫) ক্যাষ্টর অয়েল ২।৩ আউন্স

(৬) অলিভ অয়েল বা নারিকেল তৈল—গরম করিয়া, একটি শিশি গরমজলে ধুইয়া, তাহাতে রাখা থাকিলেও চলিতে পারে।

(৭) স্পিরিট এক বোতল

(৮) পাউডার বোরিক এসিড যুক্ত

(৯) ৩টী পেট বাঁধা— ১ হাত চওড়া ও দেড় হাত লম্বা

(১০) ৩।৪ টী এনামেল বেসিন বা বড় মাটীর গামলা, নূতন ও পরিস্কার

(১১) এক আউন্স ব্রাণ্ডি

(১২) একটি বড় কাঁচের পিচকারী

(১৩) প্রসবের সময়ের কিছু পূর্ব্বেই উনানে আগুন থাকা উচিত, কিংবা একটি ভাল ষ্টোভ প্রস্তুত থাকা দরকার; কারণ সেই সময় গরম জল প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হয়; এবং ২ গামলা গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া রাখা দরকার।

সন্তানের জন্য

যে ঋতুতেই প্রসব হউক না কেন সন্তানের জন্য কাপড় হালকা, ও কাচা যায় এই প্রকার, হওয়া আবশ্যক। সহজেই পরানো বা খোলা যায়, পেট বা বুকে ঢিলা থাকে, এইরূপ জামা কাপড়ই বিধেয়। আঁতুড়ের জন্য পরিষ্কার পুরাতন নেকড়ার জামাই সকলের পক্ষে সহজসাধ্য। নাড়ী কাটিবার পর "পেট বাঁধা" আঁতুড়ঘরেই তৈয়ারী করিয়া রাখা দরকার।

(১) ৩ খানি সেলুলার কটন বা সিল্ক সার্ট, গায়ের জন্য

(২) ৩টী পেট বাঁধা, ৪ ইঞ্চি চওড়া ও ২৮ ইঞ্চি লম্বা

(৩) ৩টী পেটী কোট

(৪) ৪টী ফ্রক

(৫) ২৪ খানা কাঁথা বা ন্যাপকিন—কাচা যায় এইরূপ

(৬) ৬টী বিব

(৭) ২% প্রোটারগল লোসন, অভাবে বরিক এ্যাসিড লোসন; অথবা গরমজলে একটু বোরিক এ্যাসিড পরিষ্কার শিশিতে রাখিয়া দিলেই হইতে পারে।

(৮) একটী কাঁচি,

(৯) খানিকটা শক্ত সুতা

প্রসব

প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে তলপেটে ব্যথা ধরে—উরুদ্বয় ভারী বোধ হয়, প্রস্রাবের বেগ আসে এবং তলপেটে কি ঠেলিয়া ধরিতেছে এইরূপ বোধ হয়। প্রথমে এই বেদনা নিয়মিতরূপে পরে পরে হইতে থাকে; প্রসবের দিন সন্নিকট হইলে বেদনা উঠিলেই ৪ চামচ কাষ্টর অয়েল খাওয়া উচিত—প্রসবের পূর্ব্বে বেশ ভাল করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যাওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রথম পোয়াতী প্রায় ১২—১৬ ঘণ্টা ব্যথা খাইয়া থাকেন; যাঁহাদের পূর্ব্বে সন্তানাদি হইয়াছে তাঁহারা ৪—৬ ঘণ্টা ব্যথা খাইয়া থাকেন; এই সময় নাড়ীর মুখ ফাঁক হইয়া সন্তান বাহির হইবার পথ প্রস্তুত হইতে থাকে। জোলাপ লইয়া কোষ্ঠ সাফ হইলে বেদনা কম খাইতে হয়, এবং প্রসবের সময় কষ্টও কম হয়। বেদনা যত ঘন ঘন হইতে থাকে ও যত বেশী দেরী পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, ততই প্রসবের সময় সন্নিকট জানিতে হইবে। প্রথমে ২।১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর বেদনা আসে ও অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, পরে ৪।৫ মিনিট অন্তর বেদনা আসে ও ½—১ মিনিট স্থায়ী হয়, এবং প্রসবের সময় খুব তাড়াতাড়ি বেদনা আসে ও ½—২ মিনিট স্থায়ী হয়।

ব্যথা উঠিলেই প্রসূতিকে আঁতুড়ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত এবং সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক করিয়া রাখা দরকার। এই সময় দুই হাঁড়ী গরম জলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পরিষ্কৃত গামলায় দুই গামলা জল ঠাণ্ডা করিতে দেওয়া দরকার। এই সময় প্রসূতি বেড়াইয়া বেড়াইতে পারেন। ইতিমধ্যে জল, তুলা, নেকড়া যাহা রাখা আছে, সেগুলি প্রসূতির বিছানার নিকট সাজাইয়া রাখা আবশ্যক। একটি গামলা জলে, ১ কোয়ার্টে ১ চামচ এই পরিমাণ, কার্ব্বলিক বা লাইজল দিয়া রাখা উচিত।

ব্যথা ঘন ঘন হইবার পূর্ব্বে যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া না থাকে, তবে পিচকারী ও সাবান জল দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া দেওয়া উচিত। প্রসূতিকে, বিশেষতঃ যাঁহাদের পূর্ব্ব সন্তানাদি হইয়াছে তাঁহাদের, এই সময় পায়খানায় যাইতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ অনেক সময় পায়খানাতেই প্রসব হইয়া পড়িয়া অনর্থ ঘটিতে পারে।

প্রসূতি যখন ব্যথা খাইতেছেন, তখন আত্মীয় বা ধাত্রীর কর্ত্তব্য যে প্রসূতি যাহাতে প্রসবের সময়ের জন্য প্রস্তুত হন তাহাতে সাহায্য করা—তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে

প্রসবের সময় কোন চিন্তার কারণ নাই এবং মনের জোর করিলেই প্রসবের কষ্ট কম হইবে—উতলা হইলে আরও কষ্ট বেশী অনুভূত হইবে। প্রসূতিও সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে জানিতে পারিলে, এবং প্রসব সময়ে তাঁহাকে যিনি পরিচর্য্যা করিবেন তিনি এ সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন জানিতে পারিলে, আশ্বস্ত হইবেন, এবং তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে না। এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ প্রথম প্রসূতির সময়।

ধাত্রীও প্রসবের সময় যখন সন্নিকট হইতে থাকিবে, নিজেকে তৈয়ারী করিতে থাকিবেন। তাঁহার হাত পা বেশ ভাল করিয়া ধোয়া উচিত—হাতের কুনুই পর্য্যন্ত সাবান ও গরমজলে ধৌত করা উচিত—নখ ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা আবশ্যক; নখের ভিতর বহু বীজাণু থাকে এবং নখ বড় বড় থাকিলে সেইগুলি ভাল করিয়া হাত ধুইলেও থাকিয়া যায়, এবং প্রসূতির শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। বাহিরে বেশ ভাল করিয়া হাত পা সাবান জলে ধুইয়া ধাত্রী, আঁতুড়ের জন্য যে ধোয়া কাপড় রাখা আছে, তাহাই পরিধান করিবেন।

যদি প্রসূতি গর্ভের সময় একজামিন হইয়া থাকেন এবং যদি সন্তান ও প্রসবের রাস্তার কোন দোষ না থাকে, তবে এই অবস্থায় ধাত্রীর কোন কার্য্যই থাকে না—অযথা ভিতরে হাত দেওয়া, বা রাস্তা বড় করিবার অছিলায় ঘাঁটাঘাঁটি করা বিশেষ-ভাবে অন্যায়। ইহাতে বাহিরের জীবাণু ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং প্রসূতিকে নানাপ্রকার রোগে আঁতুড়ঘরেই ভোগায়; এইরূপ ঘাঁটাঘাঁটি করার কোন আবশ্যক নাই।

এই সময় কাঁচি ও সুতা, সন্তানের নাড়ী বাঁধিবার জন্য একটি বাটিতে গরমজলে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা হইবার জন্য, রাখিয়া দেওয়া বিধেয়।

পরে যখন "পানমুচকী" ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আর প্রসূতির বেড়াইয়া বেড়ান উচিত নহে। মাদুরে পরিষ্কার চাদর বা নেকড়া যাহা কাচা আছে, কিংবা খাটে তোষকের উপর ম্যাকিনটস বা অয়েল ক্লথ পাতিয়া প্রসূতিকে শয়ন করানোই নিয়ম। এই সময় ঘন ঘন বেদনা হওয়ায় প্রসূতির বিশেষ কষ্ট হইতে থাকে, সুতরাং

তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত। "ধরুনী"র সাহায্যের অভাবে জাঁনালায় বা খাটে একটি চাদর বাঁধিয়া দিলেও চলিতে পারে। এই চাদর ধরিয়া "কোঁথ" দিলে কষ্টের লাঘব হয় এবং ব্যথা খাওয়ার সাহায্য হয়। কোঁথ দিবার সময় মনে রাখা দরকার যে ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথ দেওয়ার দরকার, নতুবা অযথা বলক্ষয় হয়। যখন বেদনা উপরি উপরি আসিতে থাকে ও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়, তখন বুঝিতে হইবে প্রসবের আর অধিক বিলম্ব নাই; ধাত্রী সেই সময় গামলায় রক্ষিত কার্ব্বলিক জলে বা লাইসল জলে ভাল করিয়া হাত ধুইয়া লইবেন। যখন সন্তান বাহির হইতেছে, সেই সময় সন্তানের মাথা যাহাতে ধীরে ধীরে বাহির হয় তাহার জন্য হাতের তেলো দিয়া ব্যথার সময় সন্তানের মাথা চাপিয়া রাখিতে হয়, ইহাতে প্রসব পথ ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যায়। যদি প্রসবপথ ছিঁড়িয়া যায়, তবে ডাক্তার দ্বারা প্রসবের পরই সেলাই করাইয়া দেওয়া উচিত; তাহা না করিলে পরে নাড়ীর দোষ জন্মাইয়া যাইতে পারে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ৪।৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া, সন্তানের নাভিমূল হইতে ৫ আঙ্গুল বাদ দিয়া সুতা দিয়া

শক্ত করিয়া বাঁধিতে হয়, এবং দুই আঙ্গুল আরও উপরে আর একটী বন্ধন দিতে হয়। এই দুইটী বন্ধনের মধ্যে কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, গরমজল যাহা ঠাণ্ডা করিয়া আর একটী গামলাতে রাখা আছে, তাহাতে তুলা ভিজাইয়া চোখ মুছিয়া দিতে হইবে, এবং দুই ফোঁটা প্রোটারগল বা বোরিক লোসন চোখে ফেলিয়া দিতে হইবে। যদি প্রসূতির কোন প্রকার স্রাব থাকে, তবে এই দূষিত স্রাবের সংস্পর্শে সন্তানের চক্ষু খারাপ হইয়া যাইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে পিতা মাতার গণোরিয়া থাকার দরুণ মাতার স্রাবে সন্তানের চক্ষু দূষিত হইয়া যায়—চক্ষু লাল হইয়া উঠে, পুঁজ পড়ে, ইহাতে সন্তান অন্ধ পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। সেই কারণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চক্ষু মুছিয়া দিয়া প্রোটারগল লোসন দিলে চক্ষু রক্ষা পাওয়ারই সম্ভব।

ধাত্রী অপর কোন আত্মীয়াকে সন্তান স্নান করান বা পরিষ্কার করার জন্য দিবেন। সন্তানকে বেশ করিয়া তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতে হয়—ঈষৎ উষ্ণ জলই প্রকৃষ্ট।

স্নান করাইবার সময় দেখিয়া লওয়া আবশ্যক যে সন্তানের প্রস্রাব ও গুহ্যদ্বার স্বাভাবিক কি না। স্নানের পর গা মুছাইয়া, কাটা নাড়ীর মুখে তুলায় করিয়া সামান্য টিনচার আইডিন ছোঁয়াইয়া দিয়া—তুলা দিয়া নাড়ী বাঁধিয়া দিতে হয়। পরে জামা পরাইয়া শিশুকে আঁতুড়ঘরের একপার্শ্বে শোয়াইয়া দেওয়া উচিত।

যদি সন্তানের নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে দেরী হয়, তবে মুখ নেকড়া জড়ান অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত; ইহাকে চলিত ভাষায় "ঘড়ঘড়ি ভাঙ্গা" বলে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর "ফুল" পড়িয়া যায়। ফুল বাহির হইতে কাহারও ২।৩ মিনিট লাগে, কাহারও বা ১ ঘণ্টা লাগে; অধিক রক্ত স্রাব না হইলে, ও ফুল পড়ার বিলম্ব হইলে, সাধারণ ধাত্রীর ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে—অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করা উচিত। এই সময়, ফুল পড়িবার দেরী হইতেছে বলিয়া, ধাত্রীগণ জোর করিয়া ফুল বাহির করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়া থাকে এবং ফলে অনিষ্টের সৃষ্টি করে—ফুল কিয়দংশ ছিঁড়িয়া জরায়ুর মধ্যে থাকিয়া গেলে রক্তস্রাব হয়, ও পরে

বিষাক্ত হইয়া পড়ে। ফুল যদি ১ ঘণ্টায় বহির্গত না হইয়া যায়, এবং যদি অধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে ভিতরে হাত না দিয়া কিংবা নাড়ী ধরিয়া টানাটানি না করিয়া, পেটের উপর হইতে জরায়ুর উপর চাপ দিয়া ঠেলিলে ফুল বাহির হইয়া যায়। ফুল পড়িয়া যাইবার পর, পেটে জরায়ুর উপর মালিশ করিয়া দেওয়া উচিত এবং জরায়ু ছোট হইয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে কিনা দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। প্রসবের অব্যবহিত পরে "ফুল" বাহির হইবার পর জরায়ু প্রায় নাভিস্থলের নিকট অনুভূত হয়; তৎপরে জরায়ু ধীরে ধীরে ছোট হইতে থাকে—দশম দিবসে তলপেটে হাড়ের নিকট আসিয়া পড়ে। যদি জরায়ু ঠিক নিয়মিতরূপে ছোট হইতে না থাকে, তবে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত করিয়া লওয়া উচিত। ফুল বাহির হইয়া যাইবার পর ১ ড্রাম লিকউইড এক্সট্রাক্ট অব আরগট প্রসূতিকে একটু জলের সহিত পান করিতে দিতে পারিলে ভাল হয়; ফুল পড়িবার পূর্ব্বে কোন ঔষধ দেওয়া ধাত্রীর পক্ষে অন্যায়।

তৎপরে প্রসূতিকে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রক্তস্রাবে যাহাতে বিছানা অপরিষ্কার না হয়, তাহার জন্য তুলা দিয়া

একটী নেকড়ার "কাছ" দিয়া দেওয়া উচিত। পেট বাঁধা কাপড় দিঁয়া জোর করিয়া পেট বাঁধিয়া দেওয়া ভাল।

প্রস্থতির বিছানা পরিস্কার করিয়া দিয়া তাঁহাকে শয়ন করিতে দেওয়া উচিত, এবং ঘরে কোন প্রকার গোলমাল না হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রসবের সময় শরীরে যে "ধকল" পড়ে, তাহাতে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে এবং বিশ্রাম বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়া পড়ে, সুতরাং প্রসবের পর প্রস্থতিকে বিশ্রাম দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর অনেক আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব প্রস্থতির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেন; তাহা মূলেই যুক্তিসঙ্গত নহে; ইহাতে সন্তান ও প্রস্থতির শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

প্রসবের পর

প্রসূতি

গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জরায়ু ও অন্যান্য স্ত্রীঅঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। আমাদের দেশে আঁতুড়ের অশুচি ১ মাস থাকে ; এই নিয়ম অতি সুন্দর এবং প্রসূতি ও সন্তানের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সন্তান বহন ও তাহার আহার সংগ্রহের জন্য প্রসূতির শরীরকে যে অধিক পরিমাণ কার্য্য করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, স্ত্রী-অঙ্গ ও জরায়ু প্রভৃতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেগুলি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া না আসিলে প্রসূতির স্বাস্থ্যের হানি হয় এবং এমন অনেক প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করে যাহাকে জরায়ু সঙ্ঘটিত-দোষ বলা যাইতে পারে ; চলিত ভাষায় এই ব্যাধি-গুলিকে "নাড়ী সরিয়া" যাওয়া বা "নাড়ীর দোষ" বলা হয়। সুতরাং প্রসবের পর মাতার বেশী নড়াচড়া করা এবং ভারী জিনিস তোলা আপত্তিজনক ; এই জন্য আমাদের ১ মাস আঁতুড়ের প্রথা সুযুক্তিপূর্ণ।

প্রসবের পর ধাত্রী কিংবা ডাক্তারের কর্ত্তব্য যে অন্ততঃ ১২ দিন প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন।

প্রথম ১০ দিন শুইয়া থাকাই বিধেয়। এই সময়ে জর

কিংবা নাড়ীর বেগ খুব বেশী থাকা সাধারণ নিয়মের মধ্যে নহে। প্রসবের পরই সামান্য জ্বরভাব বা নাড়ীর সামান্য বেগ হইতে পারে কিন্তু ইহা ২৪ ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হওয়া ভাল নহে—যদি ২৪ ঘণ্টার পর নাড়ীর বেগ প্রতি মিনিটে ১০০বারের বেশী হয় কিংবা শরীরের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রির বেশী হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথম ২৪ ঘণ্টা।

প্রসবের পর ফুল পড়িয়া গেলে জরায়ু ছোট ও শক্ত হইয়া নাভীর নিকট আসিয়া পড়ে। যদি জরায়ু শক্ত হইয়া না যায়, তবে পেটের উপর ধীরে ধীরে মালিশ করিয়া দেওয়া উচিত এবং ৬০ ফোঁটা আর্গট খাইতে দেওয়া উচিত।

স্তন পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং সন্তানকে প্রথম তিন দিন, প্রত্যেক ৬ ঘণ্টা অন্তর, স্তন পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সময়ের পর নিয়মিতরূপে প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর স্তন পান করিতে দিতে হয়। প্রথম তিন দিন স্তনে প্রায়ই দুগ্ধ থাকে না; কিন্তু সেই সময় শিশুকে স্তন টানিতে দিলে

জরায়ু ছোট ও সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

স্তনের বোঁটার উপর দুধ জমিয়া থাকিলে, শিশু যখন মাড়ী দিয়া চিবাইতে থাকে, তখন স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায়; ইহাতে ঘা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মাতার শিশুকে স্তন দেওয়া কষ্টকর হইয়া থাকে। সেই জন্য স্তনের বোঁটা সব সময়, বিশেষতঃ স্তন পান করার পর, পরিষ্কার রাখা দরকার। প্রসবের ৬ ঘণ্টা পর শিশুকে স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ইহাতে জরায়ু ছোট হইবার পক্ষে সাহায্য করে।

যদি প্রসবের পর তলপেটে বেশী ব্যথা হয়, তবে জরায়ুর উপর তলপেট ধীরে ধীরে মালিস করিয়া দেওয়া উচিত—৬ ঘণ্টা অন্তর, ৬ মিনিট করিয়া, মালিস করিয়া দিলেই বেদনা কম হইয়া যাইবে।

এই সময় মাতার নিদ্রার ব্যাঘাত করা উচিত নহে এবং যতটা নিদ্রা হয় ততই ভাল।

সন্তানের পুরীষ নির্গম হইয়াছে কি না দেখা উচিত। অনেক সময় গুহ্যদ্বার না থাকার দরুণ কাল রংয়ের ময়লা বাহির হইতে পারে না—এবং পেট ফুলিয়া শিশুর মৃত্যুও হইতে পারে। সুতরাং শিশুকে স্নান করানোর সময়ই তাহার প্রস্রাবের নালী ও গুহ্যদ্বার ঠিক আছে কি না, তাহা দেখিয়া লওয়া উচিত। যদি কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তবে ডাক্তারকে দেখাইয়া ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক।

যদি সন্তানের ওজন লওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহা লওয়াই উচিত; কারণ, তাহা হইলে সন্তান কিরূপভাবে ওজনে বাড়িতেছে, জানা যাইবে।

প্রসবের পর অনেক প্রসূতির বহুক্ষণ প্রস্রাব হয় না—২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রস্রাব বন্ধ না থাকিলে ক্যাথিটার বা নল যন্ত্র সাহায্যে প্রস্রাব করাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আবশ্যক নাই। জল, দুধ, চা প্রভৃতি জলীয় পদার্থ পান করিতে দিলে প্রায় ৫।৭ ঘণ্টার মধ্যে স্বতঃই প্রস্রাব হইয়া যায়; যদি না হয়, তলপেটে সেঁক দিলে, প্রসূতির পিঠের তলায় বালিস দিয়া কোমর অল্প উঁচু করিয়া রাখিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। ব্যস্ত

হইয়া ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইলে অন্যান্য রোগের সৃষ্টি হইয়া প্রসূতি কষ্ট পাইতে পারেন; চিকিৎসক দ্বারাই ক্যাথিটার দেওয়ান যুক্তি সঙ্গত, এবং ক্যাথিটার দিবার পূর্ব্বে তাহা গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

১২ ঘণ্টার পর স্রাবের পরিমাণ ঠিক সাধারণভাব হইতেছে, কি অধিক পরিমাণ কিংবা কম পরিমাণে হইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

দ্বিতীয় দিবস

দ্বিতীয় দিবস রাত্রে মাতাকে হালকা জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্যাষ্টর অয়েল—৪ চা চামচ; কিংবা সিরাপ অফ ফিগস—৪ চা চামচ; কিংবা হরিতকী চূর্ণ—১ চামচ; কিংবা হরিতকী ৩টা বহেড়া ২টা ভেজান জল, খাইতে দেওয়া উচিত, যাহাতে তৃতীয় দিবস প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমাদের দেশে সেঁক দিবার প্রথা আছে। সেঁক দিতে কোন আপত্তি নাই বরং সেঁক দেওয়াই ভাল; কিন্তু আঁতুড় ঘরে

সেঁকের আগুন ধরানো আপত্তিজনক ; কারণ ধোঁয়াতে ঘর ভর্ত্তি হইয়া যায় এবং তাহা প্রসূতির পক্ষে কষ্টদায়ক হইয়া ওঠে।

তৃতীয় দিবস

তৃতীয় দিবস স্তনে দুধ হয়, সেই জন্য স্তন ভারী হয় এবং বেদনাযুক্ত হইয়া ওঠে। শিশুকে স্তন পান করিতে দিলে এই বেদনার লাঘব হয়।

স্তন ভারী হইলে অনেকে "পাম্প" লাগাইয়া দুধ বাহির করিয়া থাকেন ; ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। পাউডার কিংবা শুক্‌না ময়দা দিয়া মালিস করিয়া দিলেই বেদনার লাঘব হইবে। মালিস করিয়া দিবার পর শিশুকে স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত। যদি স্তন অত্যন্ত ভার বোধ হয়, তবে ঢিলা কাঁচুলি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। যদি ইহাতে বেদনার লাঘব না হয়, তবে গরম জলে কাপড় বা ফ্লানেল ভিজাইয়া, নিংড়াইয়া লইয়া, স্তনের উপর বাঁধিয়া রাখিলে বেদনার উপশম হয়। ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এইরূপ ভাবে বাঁধিলেই চলিবে। স্তনের বোঁটা

কাটিয়া গেলে বোরিক এ্যাসিড ও মাখন মিশাইয়া লাগাইয়া দিতে হয়, এবং স্তনের বোঁটা সাবান জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। কাটা বোঁটার উপর দুগ্ধ শুকাইয়া থাকিলে, স্তনের উপর ঘা হয়, এবং প্রসূতিকে কষ্ট দিয়া থাকে।

স্তনের বোঁটা কাটিয়া গেলে শিশুকে স্তন পান করিতে দিবার পূর্ব্বে গরম জলে ধুইয়া লওয়া দরকার—ইহাতে স্তনও নরম হয়, স্তন দিবার সময় ব্যথা কম লাগে এবং সন্তানের পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। স্তন পান করানর পর (বোরিক এ্যাসিড ১ আউন্স, গরম জল ঠাণ্ডা করা ১ পাইণ্ট) বোরিক লোসনে স্তনের বোঁটা ধুইয়া ফেলা উচিত। শিশুকে স্তনের বোঁটা মুখে দিয়া কখনও ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—ইহাতে বোঁটা কাটিয়া ঘা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থ—ষষ্ঠ দিবস

প্রসবের পর রক্ত মিশ্রিত স্রাব নিয়মিতরূপ হইতে থাকে; ইহার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়া যায় এবং চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ দিবসের মধ্যে স্রাব হরিদ্রাভ হইয়া থাকে। যদি স্রাবের পরিমাণ

হঠাৎ কমিয়া যায়, কিংবা ষষ্ঠ দিবসের পরও রক্ত মিশ্রিত হইতে থাকে, কিংবা স্রাব যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয় তবে জরায়ুঘটিত কোন দোষ জন্মাইতেছে বুঝিতে হইবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য ; যদি এই উপসর্গের সহিত জ্বর ও নিদ্রাহীনতা বর্ত্তমান থাকে, তবে চিকিৎসকের ব্যবস্থা অবিলম্বেই লওয়া উচিত, কারণ বীজাণুঘটিত রোগের সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে।

পঞ্চম দিবসে :—সাধারণতঃ সন্তানের নাড়ী ৫ম দিবসে স্বতঃই খসিয়া পড়ে।

তৃতীয় হইতে পঞ্চম দিবসের মধ্যে প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই সময় যদি জ্বর হয়, মাথা ধরে, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, কিংবা যদি নাড়ীর গতি দ্রুত বা বিষম হইয়া পড়ে, কালক্ষেপ না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত, এবং বীজাণুদূষিত কোন প্রকার রোগের সৃষ্টি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

তৃতীয় দিবসের পর যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সাধারণ খাদ্যই পথ্য হওয়া উচিত।

প্রসূতি

প্রসবের পর প্রসূতিকে যতটা সম্ভব দুধ খাইতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক—বৈকালে দুধ সাগু বেশ বলকারক ও উপযোগী খাদ্য। দৈনিক ২৷৩ মাস পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১ সের দুধ দেওয়াই সঙ্গত। এই সময় প্রচুর পরিমাণে জল ও জলীয় পদার্থ খাইতে দেওয়া উচিত। প্রাতে ১ গেলাস ও শুইবার সময় ১ গেলাস জল খাওয়া উচিত। আহারের সময় দুধ খাইতে দেওয়াই ভাল; খা'ল পেটে দুধ খাইলে অনেক সময় পেট ফাঁপিয়া থাকে। হজম শক্তির অধিক আহার অন্যায়; বদ হজম বা অম্বল হইলে, স্তনের দুগ্ধের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এবং সন্তানের পেটের অসুখ করিয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যেক মাতার দেখা কর্ত্তব্য যে সন্তান লালন ও পালন সময়ে তাঁহাদের নিজেদের হজম শক্তির হানি না হয়। গুরুপাক কোন জিনিষ খাওয়া বিধেয় নহে এবং অধিক পরিমাণে আহার করা অনুচিত।

অনেকের ধারণা আছে যে প্রসবের পর কোন একটা কিছু "টনিক" দিলেই প্রসূতি বল পাইবেন; যথা ম্যানোলা, ভাইব্রোনা ইত্যাদি। টনিক অর্থে পেটেণ্ট ঔষধ বুঝায়—এমন কোন পেটেণ্ট ঔষধ হইতে পারে না, যাহা সকলেরই সকল সময়ে উপযোগী হইবে। সুতরাং প্রত্যেক প্রসূতির জন্য টনিক বাছাই

করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। প্রসূতির জন্য টনিক বাছাই করিতে কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক—শরীরে কোন প্রকার রোগ না থাকিলে সহজপাচ্য বলকারক খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল টনিক,—যথা দুগ্ধ, মশুর বা মুগের দালের যুস, মাছ, মাংসের ঝোল, ফল, তরী তরকারী ও শাকসব্জী প্রভৃতি; এইরূপ প্রসূতিকে বিশেষতঃ শীতকালে রেডিওমল্ট, বা অন্য কোনও প্রকার কর্ডলিভার অয়েল দেওয়া যাইতে পারে। প্রসূতি যদি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকেন, তবে ইষ্টন সিরাপ, ইসানোফিল, অর্থাৎ যাহাতে কুইনাইন, আয়রণ ও আর্সেনিক আছে এইরূপ পেটেন্ট ঔষধই ভাল; এই স্থলে কুইনাইন প্রত্যহ ৫ গ্রেণ ও ষ্টিয়ারর্নস্ ওয়াইন অফ কডালভার ওয়েল দেওয়া ভাল। প্রত্যেক প্রসূতিকে প্রসবের পর ক্যালসিয়ামে ঘটিত ঔষধ দেওয়া আবশ্যক; অভাবে চুনের জল ও চামচ দেওয়া যাইতে পারে। যে প্রসূতির পথ্যের ব্যবস্থা বেশ ভাল ভাবে হইতে পারে, তাহাকে ম্যানোলা জাতীয় টনিক দেওয়াও যাইতে পারে।

যদি স্তনে সন্তানের পোষণোপযোগী দুগ্ধ না থাকে, প্রসূতিকে দুধ সাগু অধিক পরিমাণে খাইতে দিতে হয়।

এই বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, (১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রসবের ৬ ঘণ্টা পর শিশুকে স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত (৮৮ পৃষ্ঠা) ; মাতার প্রথম আটার মত দুগ্ধ শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতেও সহায়তা করে।

প্রসবের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দাই বা ধাত্রী যাহাতে অযথা কোন প্রকার ঘাঁটাঘাঁটি না করেন, এ বিষয় দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে ইঁহারা কাজ দেখাইবার জন্য, কিংবা বেশী পয়সা আদায় করিবার জন্য, কিছু একটা করা দরকার এই ভ্রান্ত ধারণায় কিংবা অজ্ঞতা বশতঃ, সলা দিয়া প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করিয়া, কিংবা ফুল বাহির করিবার অছিলায় অযথা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া প্রসূতির শরীরে বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দেন, এবং প্রসূতিকে এইজন্য জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গের জন্য ভুগিতে হয়, এমন কি ইহার জন্য অনেক প্রসূতির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

প্রসবের পরই প্রসূতিকে অন্ততঃ কিছু গরম দুধ, বা অভাবে অর্দ্ধ গেলাস গরম জল খাইতে দেওয়া উচিত।

প্রসূতির আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইবার পর অন্ততঃ ৩।৪ মাস নিজের স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রসবের পর সাধারণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৩।৪ মাস সময় লাগে। এই সময় তাঁহার কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার (২৬—২৭ পৃষ্ঠা;) এই সমস্ত বিষয় ও স্বাস্থ্যের সাধারণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে [১১—১৭, ১৮—১৯, ২১—২২, ৬০—৬৭ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য] বিশেষতঃ, যাঁহাদের নিজেকে গৃহস্থলীর কার্য্যাদি করিতে হয় এবং সন্তান প্রতিপালন করিতেও হয়, তাঁহাদের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যকীয়; দিনে ১ ঘণ্টা, আহারের কিছু পরে শুইয়া থাকা বেশ ভাল প্রথা। এই সময় সাংসারিক কার্য্য করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারী জিনিষ তোলা বা ঘড়া করিয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনা উচিত নহে। যাঁহারা ব্যায়াম করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম করা অথবা খোলা জায়গায় অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা বেড়াইয়া বেড়ান উচিত।

একবার প্রসবের পর পুনরায় অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে যাহাতে গর্ভাধান না হয়, সে বিষয় সতর্ক থাকা আবশ্যক; সংযমই ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে জর্জ্জরিত, অর্দ্ধভুক্ত স্ত্রী জাতি উত্তরোত্তর সন্তান প্রসব করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং দেশের শিশুমৃত্যু ও হীনবল সন্তানের হার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এ বিষয় স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই নিজের দায়ীত্ব বোধ থাকা আবশ্যক এবং তদ্রূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রত্যেক প্রসূতির সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত

(১) সময় মত ধাত্রী নিযুক্ত রাখিতে হইবে।

(২) কোষ্ঠ প্রত্যেক দিন পরিষ্কার থাকা আবশ্যক।

(৩) দুধ, ফল ও শাক সব্জী উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিতে হইবে।

(৪) ব্যায়াম ও বিশ্রাম নিয়মিতরূপ করা আবশ্যক।

(৫) রক্তস্রাব, প্রত্যহ মাথা ধরা, হাত পা ফোলা, প্রস্রাব কম হওয়া, দৃষ্টিহীনতা, মৃগী বা ফিট হওয়া, মাথাঘোরা, বা অত্যধিক বমি হওয়া—অনর্থের মূল ও চিকিৎসা সাপেক্ষ।

(৬) আঁতুড়ঘর ও আঁতুড়ের সরঞ্জাম সময় মত ঠিক রাখিতে হইবে।

(৭) কোনরূপ উপসর্গ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে ও সেইমত নিয়ম পালন করিতে হইবে।

(৮) আধুনিক শিক্ষিতা ধাত্রী না হইলে, দেখিয়া লইতে হইবে যে তাহার নখ খুব ছোট ছোট করিয়া কাটা এবং তাহাতে কোনরূপ ময়লা নাই; ধাত্রীকে হাত, পা ভাল করিয়া ধুইয়া আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত এবং পরিষ্কার কাপড় পরান দরকার। প্রসূতি বা সন্তানের ব্যবস্থা করিবার সময় দেখা কর্ত্তব্য যে "লাইসল" জলে বা "কার্ব্বলিক" জলে ধাত্রী ভাল করিয়া হাত ধুইয়াছেন।

(৯) বিশেষতঃ প্রথম, সকল প্রসূতিরই গর্ভাবস্থায় পরীক্ষিত হওয়া উচিত (৪—৮ পৃষ্ঠা); এই পুস্তকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; কেবলমাত্র জানিয়া রাখিলেই কোন ফলোদয় সম্ভব নহে।

(১০) ক্যানসার

ক্যানসার অতি ভয়াবহ ব্যাধি, কিন্তু যদি আরম্ভ সময়ে এই রোগ ধরা পড়ে, অস্ত্রোপচারে সারিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ঋতুবন্ধ হইবার পর রক্তস্রাব, বা মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ দুই ঋতুর মধ্যে সামান্য সামান্য রক্তস্রাব এই রোগের পূর্ব্বলক্ষণ—যদিও ইহাতে নাড়ীতে ঘা হইয়া থাকে তথাপি বেদনা প্রথমেই না হইতে পারে। ৩৫ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে যদি কোন স্ত্রীলোকের যখন তখন রক্তস্রাব হইয়া থাকে, অবিলম্বে এই স্রাব ক্যানসারের কারণ কি না, ডাক্তার দ্বারা বিশেষভাবে দেখাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ক্যানসার থাকিলেও গর্ভাধান হইতে পারে, কিন্তু ইহার পরিণাম সঙ্কটজনক।

(১১) রক্তহীনতা

বহুদিন আমাশয়, জ্বর, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি ব্যাধিতে ভুগিলে রক্তহীনতা হইয়া থাকে এবং অনেক সময় "রক্তহীনতাই" মূল রোগ হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় গর্ভাধান হইলে রক্তহীনতা বৃদ্ধি হয়, ইহাতে হাঁফ ধরে, হাত, পা ফোলে এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা এত বাড়িয়া যায় যে অবিলম্বে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে প্রসূতির প্রাণহানিও হইয়া থাকে।

সন্তান

গর্ভাবস্থায় সন্তান নিজ শরীরের পরিপুষ্টির জন্য মাতার রক্ত হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে ও শরীরের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মাতার রক্তের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া দেয়, সুতরাং এই সময় মাতার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকা বিশেষ আবশ্যক এবং শারীরিক কোন উপসর্গ উপস্থিত হইবামাত্র চিকিৎসিত হওয়া প্রয়োজনীয়। গর্ভাবস্থায়, ও জন্মাইবার এক বৎসরের মধ্যে, সন্তানের স্বাস্থ্যহীনতা তাহাকে সমস্ত জীবনের জন্য হীনবল করিয়া রাখে —এ বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায় প্রসূতিকে যদি নিয়মিত ভার তুলিতে হয়, তবে বহুস্থলে দেখা যায় যে সন্তান বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় মাতার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ব্যবস্থাগুলি যে সন্তানের মঙ্গলের জন্যও বিশেষ আবশ্যকীয়, এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক মাতারই ধর্ম্ম।

সাধারণতঃ, ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশু শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কাঁদিয়া ওঠে; কোন উপসর্গ না হওয়াই উচিত। সুস্থ সবল শিশুর ওজন ৭—৯ পাউণ্ড বা ৩½—৪½ সের হইয়া থাকে।

শ্বাস কৃচ্ছ্রতা

"পান মুচকি" ভাঙ্গিয়া যাইবার পর যদি প্রসূতি বহুক্ষণ ব্যথা পাইতে থাকেন, কিংবা যদি সন্তানের মাথা না আসিয়া প্রথমেই পা আসে তবে, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া সন্তান নীল বর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ শ্বাস বন্ধ হইয়া থাকিলে, প্রথমে "ঘড়ঘড়ি" ভাঙ্গিয়া বা অঙ্গুলীতে কাপড় দিয়া গলার ভিতর মুছাইয়া দিয়া, সন্তানের পা উঁচু করিয়া ধরিয়া, পিঠের উপর আস্তে আস্তে চাপড়াইতে হয়। পরে গামলাতে ঈষৎ উষ্ণ জলে মাথা উঁচু করিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হয়; এই সময় একটী হাত ঘাড়ের নীচে, অপর হাত উরুদ্বয়ের নীচে রাখিয়া শিশুকে ধরিতে হয়, এবং ৫ সেকেণ্ড অন্তর অথবা প্রত্যেকবার ১, ২, ৩, ৪, ৫ গুনিয়া দুই হাত নিকটস্থ করিতে হয় যাহাতে শিশুকে পেটের উপর দোমড়াইয়া ধরা যায় এবং পুনরায় হাতের উপর সমানভাবে শোয়ান যাইতে পারে। ইহাতে যদি শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ না হয়, বা সন্তান ক্রন্দন করিয়া না ওঠে, তবে তাহার মুখের উপর একটী পাতলা কাপড় রাখিয়া মুখে মুখ দিয়া ফুঁ দিতে হয়—ঘন ঘন ফুঁ না দিয়া ৫ সেকেণ্ড অন্তর ফুঁ দেওয়াই উচিত। সন্তান

কাঁদিয়া উঠিলেই এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই এই প্রক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। ২।৩ ফোঁটা ব্রাণ্ডিও সেই সময় শিশুর মুখে দেওয়া যাইতে পারে; আঙ্গুলে ব্রাণ্ডি দিয়া জিহ্বায় লাগাইয়া দিলেই চলিবে।

নাড়ী বাঁধা

নাড়ী বাঁধিবার প্রক্রিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মনে রাখা উচিত যে যদি নাড়ী ঠিকভাবে বাঁধা হইয়া থাকে এবং কোন প্রকার ময়লা তাহাতে না থাকিয়া যায়, তবে ৫।৬ দিনে নাড়ী আপনিই খসিয়া পড়ে এবং নাভিস্থল বেশ শুকাইয়া যায়। নাড়ি পড়িয়া যাইবার পরও ২।৩ দিন নাভিস্থল বোরিক এর গুড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত। যদি নাভিস্থলে ঘা বা পুঁজ হইয়া যায় তবে বোরিক এ্যাসিডের জলে (½ চা চামচ বোরিক-এ্যাসিড ও ৩ চায়ের বাটী উষ্ম জল) নাভিস্থল পরিষ্কার তুলা দ্বারা ধোয়াইয়া, এইরূপ বোরিক জলে তুলা ভিজাইয়া নিংড়াইয়া নাভিস্থলে বাঁধিয়া রাখিতে হয়—প্রত্যেক ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এই বাঁধা বদলাইয়া দিতে হয়; এইরূপ ৩।৪ দিন করিলেই নাভিস্থল শুকাইয়া যাইবে। যদি তাহাতেও না শুকাইয়া যায় তবে ডাক্তারের

দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক। নাড়ী কাটা ও বাঁধা সম্বন্ধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক।

অনেক সময় অপরিষ্কার "চেঁচাড়ি" বা কাঁচি দিয়া নাড়ী কাটিবার পর শিশুর **ধনুষ্টঙ্কার** রোগের সৃষ্টি হইয়া যায় এবং হঠাৎ তড়কা, জ্বর ও ফিট হইয়া অজ্ঞান হওয়াতে সাধারণে ভূতে পাইয়াছে এই ভ্রান্ত ধারণায় 'রোজার' চিকিৎসা করাইয়া সন্তান হারাইয়া থাকেন—এক্ষেত্রে কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত এবং নাড়ী কাটিবার যেরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে (৮০—৮২ পৃষ্ঠা) তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

শিশুর চক্ষু

সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পরেই তাহার চক্ষু বোরিক এ্যাসিডের জলে মুছাইয়া দেওয়া উচিত। যদি মাতার কোন প্রকার স্রাব থাকে তবে প্রোটারগল লোসন [১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ পরিমাণ] ২ ফোঁটা চোখের মধ্যে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রসূতির গণোরিয়ার স্রাব থাকার কারণে অনেক সন্তানই চক্ষু

রোগে কষ্ট পায়। যদি সন্তানের চক্ষু লাল হইয়া উঠে তবে বোরিক-এ্যাসিডের গরম জলে নেকড়া বা ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া সেঁক দেওয়া উচিত এবং তৎপরে প্রোটারগল লোসন ২ ফোঁটা দিতে হয়। যদি ৬।৭ দিনে চক্ষু পরিস্কার হইয়া না যায়, তবে চিকিৎসককে দেখান দরকার।

শিশুর চক্ষু প্রথমে জোর আলো বা রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না—আলো বা রৌদ্র শিশুকে ধীরে ধীরে সহ্য করাইয়া লইতে হয়। হঠাৎ তীব্র আলোকে বা রৌদ্রে শিশুকে বাহির করিলে তাহার দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

শিশুর আহার—

মাতৃস্তনের দুগ্ধের ও মাতার স্নেহের বিনিময় হয় না; মাতৃদুগ্ধই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য।

আধুনিক সভ্যতার ফলে অনেক মাতা শিশুকে স্তন পান করাইতে চান না এবং তৎপরিবর্ত্তে বোতলের পেটেন্ট দুগ্ধ প্রভৃতি খাইতে দেন; সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের মাতৃজাতির

অনেকেরই এতদূর অবনতি হয় নাই। অনেকের ধারণা আছে যে শিশুকে স্তন পান করাইলে তাঁহাদের নিজেদের স্বাস্থ্য হানি হইয়া যাইতে পারে—ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। শিশুকে ৯ মাস পর্য্যন্ত মাতৃদুগ্ধের উপর রাখিতে পারিলেই ভাল হয়—তিনমাস পর্য্যন্ত মাতৃদুগ্ধে পুষ্ট না হইলে জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে; সুতরাং শিশু যাহাতে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয় চেষ্টিত থাকা প্রত্যেক মাতারই কর্ত্তব্য ও নারীধর্ম্ম, এই জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের ও আহারের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—এই বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে সমস্ত দুগ্ধ বোতলে বা টিনে বিক্রয় হইয়া থাকে, সেগুলি, সমস্তই এমন কি গরুর দুধও, মাতৃদুগ্ধের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং এইগুলি মাতৃদুগ্ধের অভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য তাহার জীবনের প্রথম বৎসরের উপর নির্ভর করে, ও প্রথম বৎসরের জীবন এবং সন্তানের জীবনীশক্তি মাতার স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর করে। স্তন্য দুগ্ধের দ্বারা সন্তানকে পালন করিতে হইলে মাতার নিজের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার শরীরে কোন প্রকার রোগ থাকা উচিত নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কার

থাকিলে, এবং শরীরে অন্য কোন রোগ না থাকিলে সাধারণ পরিমাণ আহারই প্রত্যেক মাতার পক্ষে যথেষ্ট; সন্তানের দুগ্ধের জন্য মাতার অধিক আহারের প্রয়োজন হয় না; কেবল দুগ্ধ এবং জল কিছু অধিক পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক। যাঁহারা বেশী দুধ খাইতে পারেন না তাঁহাদের ঘোল, দুধসাগু খাওয়া চলিতে পারে। এই সময় মাতার পক্ষে ফল ও শাকশব্জী বেশ উপকারী খাদ্য। স্তন্য দুগ্ধের অল্পতা বা বিকৃতি মাতার স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। যে সমস্ত খাদ্যে অম্বল, বদহজম, বুক-জ্বালা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রভৃতি হইয়া থাকে তাহা পরিত্যজ্য; মসলা ও ঝালের পরিমাণ কম খাওয়া উচিত।

স্তন পান করাইবার নিয়ম

প্রথম তিনদিন ৬ ঘণ্টা অন্তর, তৎপরে প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত; যথা—প্রাতে ৬টা, ১০টা, দুপুরে ২টা, বৈকালে ৬টা, ও রাত্রে ১০টার সময়। স্তন পান করিবার সময় শিশু যে স্তন প্রথমে পান করে সেইটাই জোরে টানে, পরে টান শিথিল হইয়া পড়ে—সেইজন্য দক্ষিণ স্তন প্রথমবার পান করিতে দিলে, দ্বিতীয়বার বামটী প্রথম

দিতে হয়; প্রত্যেকবার কিন্তু উভয় স্তনই পান করিতে দেওয়া উচিত। প্রথমদিন প্রত্যেক স্তন ২মিনিট-কাল, দ্বিতীয় দিন ৩মিনিট কাল, তৃতীয়দিন ৪মিনিট কাল এইরূপ ভাব বাড়াইয়া প্রত্যেক স্তন পরে পরে ১০ মিনিট কাল পান করিতে দিতে হয়। ঘড়ি ধরিয়া এই নিয়ম পালন করা উচিত। এই নিয়মে মাতার কষ্ট হয় না, প্রসূতি কিংবা সন্তানের বিশ্রামেরও ব্যাঘাত হয় না এবং সন্তানএর শরীরের পুষ্টিসাধন নিয়মিতরূপে হইতে পায়; এই নিয়ম হিসাব করিয়া প্রথম হইতে পালন করিলে শিশু যখন তখন ক্রন্দন করে না, মাতার ও শিশুর বিশ্রামের ব্যাঘাতও হয় না; এবং অতি মাত্রায় কিংবা কম দুগ্ধ পান করিতেও পায় না। বিনা নিয়মে, পরিমাণের হিসাব না করিয়া শিশুকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া, তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং তাহার হজম শক্তির ব্যাঘাতজনক। এই নিয়ম পালন করিলে রাত্রে ১০টার পর আর স্তন পান করাইবার আবশ্যক হয় না; শিশু যদি রাত্রে ক্রন্দন করে তাহা হইলে দুই চামচ জল দেওয়া উচিত। **ভবিষ্যতে আপত্তিজনক হইতে পারে, এমন কোন অভ্যাস শিশুকালে করান কর্ত্তব্য নহে।**

সচরাচর আমরা শিশুদিগকে অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করাইবার পক্ষপাতী ; ইহাতে বদহজম, পেটের দোষ, প্রভৃতি হইয়া পড়ে। যাঁহারা, পরিমাণ কম কি বেশী হইতেছে সে বিষয়ে সন্দিহান, তাঁহারা দুগ্ধপান করাইবার পূর্ব্বে ও পরে শিশুকে ওজন করিলেই দুগ্ধের পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। অতি ভোজনে কিংবা বিনা নিয়মে দুগ্ধ পান করাইলে পেটের দোষ ব্যতীত, শিশু "কাঁদুনে, ও "খিটখিটে" হয়।

স্তনের পরিচর্য্যা

গর্ভাবস্থায় স্তনের পরিচর্য্যার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (২৫ পৃষ্ঠা) ; স্তনের বোঁটা পরিষ্কার রাখা উচিত ; স্তনের বোঁটা বোরিক এ্যাসিডের জল বা সাবান জল দিয়া ধুইয়া ফেলা যাইতে পারে। যদি স্তনের বোঁটা অতিরিক্ত নরম হয় এবং দুধ গড়াইয়া পড়ে, স্পিরিট ও জল দিয়া বোঁটা ভিজাইয়া রাখিলে শক্ত হইয়া থাকে ও দুধ গড়ান বন্ধ হইয়া যায়। যদি স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায় তবে বোঁটা ধুইয়া তাহাতে মাখন ও বোরিকের গুড়া মিশাইয়া লাগান যাইতে পারে কিংবা "ফ্রাইয়ার্স বলসাম" লাগান যাইতে পারে। স্তনের বোঁটা অপরিষ্কার থাকিলে এবং ফাটিয়া গেলে ফোড়া পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মাতৃদুগ্ধের অল্পতা বা আধিক্য

যদি স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ অল্প হয়, তবে শিশুকে স্তনপান করাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মাতার ১গেলাস গরম জল, কিংবা দুধ কিংবা পাতলা দুধসাগু খাওয়া ভাল। সুস্থ ও সবল মাতার স্তনে সাড়ে তিন হইতে ৪পাইন্ট দুধ প্রত্যহ হওয়া উচিত। যদি সন্তানের টান বেশ জোর না হয়, তাহা হইলে হাতে করিয়া টিপিয়া দুগ্ধ বাহির করিয়া দিতে হয় এবং দুগ্ধের পরিমাণ কম হইলে এইরূপ টিপিয়া দুগ্ধ বাহির করিবার চেষ্টা করা উচিৎ; সন্তান স্তন পান না করিলেও নিয়মিত ৪ ঘণ্টা অন্তর মাতার স্তনের দুগ্ধ বাহির করিয়া দিতে হয়—নতুবা স্তনের দুধ কম হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। নিয়মিত ও সহজপাচ্য আহার (১১—১৭ পৃষ্ঠা), কোষ্ঠ পরিষ্কার (২৬—২৭ পৃষ্ঠা), সময় মত উপযুক্ত নিদ্রা ও বিশ্রাম (২১—২২ পৃষ্ঠা), ব্যায়াম (১৮—১৯ পৃষ্ঠা) ও স্বাস্থ্যের সাধারণ ব্যবস্থাগুলি (৬০—৬৭ পৃষ্ঠা) প্রতিপালন করিলে স্তন্যদুগ্ধের অভাব হইবার সম্ভাবনা অল্প। প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত; যদি সন্তানকে গোদুগ্ধ বা পেটেণ্ট দুগ্ধ খাওয়ান হয় তাহা হইলেও প্রত্যেকবার খাইবার সময় স্তনপান

করিতে দিতে হয়; একবার অন্য প্রকার খাদ্য ও অন্যবার স্তনদুগ্ধ দেওয়া অন্যায়। যদি দুগ্ধের অল্পতা ইহাতেও না যায়, তবে স্তনদ্বয় একবার গরম ও পরে ঠাণ্ডা জলে, এইরূপ ভাবে ৫ মিনিট ধরিয়া প্রত্যহ ২বার ধুইয়া দেওয়া উচিত। যদি এই নিয়মেও দুগ্ধের পরিমাণ না বাড়ে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

যদি দুগ্ধের মাত্রা অত্যন্ত অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে মাতার ২।৩ দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য "এপসম সল্ট" দিতে হয় এবং জলীয় পদার্থের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়। শিশুকে সম্পূর্ণ শোয়াইয়া দুগ্ধপান করাইলে পেটে বায়ু জমিয়া যায়; সেইজন্য দুগ্ধ পান করান হইলে শিশুকে কোলে একটু উঁচু করিয়া ধরিতে হয়।

প্রথম নয়মাস মাতৃস্তনের দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রথম মাসে মাতৃদুগ্ধ বিশেষভাবে আবশ্যকীয়।

অন্যান্য প্রকার দুগ্ধ

অন্যান্যপ্রকার সমস্ত দুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ হইতে বহু নিকৃষ্ট এবং মাতৃ দুগ্ধের অভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গোদুগ্ধ ও মাতৃদুগ্ধ বহু তফাৎ সুতরাং গোদুগ্ধকে মাতৃদুগ্ধবৎ করিয়া লইতে হইলে নিম্নলিখিতভাবে করিতে হয় নতুবা হজমের ব্যাঘাত ঘটে।

বাংলায় ২৭ আউন্স গোদুগ্ধের উপরিভাগ [১ সপ্তাহ বয়স্ক শিশুর জন্য ২ ঘণ্টা, ২ সপ্তাহ বয়স্ক শিশুর জন্য ৩ ঘণ্টা, তিন সপ্তাহ বয়স্কশিশুর জন্য ৪ ঘণ্টা ও তৎপর বয়স্ক শিশুর জন্য ৫ ঘণ্টা একটী পাত্রে ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিয়া দিতে হয় ; পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ২৭ আউন্সের পরিবর্ত্তে ১৮ আউন্স দুগ্ধ লইতে হয়। ২।৩টী গরুর মিশ্রিত দুগ্ধ লইলেই ভাল হয়]··· ৬ আউন্স

ছানার জল (ফুটাইয়া লইতে হয়, নতুবা দুধ কাটিয়া যায়) ··· ··· ··· ৭ আউন্স

চুনের জল ··· ··· ··· ১ আউন্স

চিনি বা সুগার অপ মিল্ক ··· ··· ১ আউন্স

গরম জল ··· ··· ··· ৬ আউন্স

অথবা

২৭ আউন্স দুগ্ধের উপরিভাগ (উল্লিখিত উপায়ে)				৮ আউন্স
চুনের জল	...	...	...	১ আউন্স
চিনি	...	...	...	১ আউন্স
গরম জল	...	...	...	১১ আউন্স

গোদুগ্ধে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা কতকগুলি উপাদান বেশী থাকায় খাঁটী বা জল মিশ্রিত গোদুগ্ধ শিশু হজম করিতে পারে না এবং জল মিশ্রিত দুগ্ধ হজম করিতে পারিলেও শরীর ধারণোপযোগী খাদ্যের সমস্ত উপাদান পাওয়া যায় না—সেইজন্য চুনের জল, চিনি প্রভৃতি মিশাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য নতুবা শিশুর বাড় কমিয়া যায় ও অন্যান্য উপসর্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্রত্যহ শিশুকে ৫ বার আহার দেওয়া কর্ত্তব্য

প্রাতে ৬টা ও ১০টা, দুপুরে ২টা, বৈকালে ৬টা, রাত্রে ১০টা; ইতিমধ্যে বা পরে একটু ঈষদুষ্ণ জল ব্যতীত কিছুই দেওয়া উচিত নহে।

আহারের পরিমাণ—ও শিশুর বয়স

জন্ম সময় হইতে		মাতৃদুগ্ধ প্রত্যেক বার	তৈয়ারী দুগ্ধ প্রত্যেক বার	ঈষদুষ্ণ জল সহ প্রত্যেক বার	মোট দৈনিক
দ্বিতীয় দিবস	...	যাহা পায়	—	২।৪ চামচ	
তৃতীয় দিবস	...	১ আউন্স	২ আউন্স	৩ আউন্স	৫ আউন্স
চতুর্থ দিবস	...	১½ ,,	৩½ ,,	৪ ,,	৭½ ,,
পঞ্চম দিবস	...	২ ,,	৫ ,,	৫ ,,	১০ ,,
সপ্তম দিবস	...	২½ ,,	৬½ ,,	৬ ,,	১২½ ,,
অষ্টম দিবস	...	৩ ,,	৮ ,,	৭ ,,	১৫ ,,
দশম দিবস	...	৩½ ,,	১২ ,,	৫½ ,,	১৭½ ,,
তৃতীয় সপ্তাহের আরম্ভে		৪ ,,	১৫ ,,	৫ ,,	২০ ,,
চতুর্থ সপ্তাহের আরম্ভে		৪½ ,,	১৮ ,,	৪½ ,,	২২½ ,,
দ্বিতীয় মাসের আরম্ভে		৫ ,,	২১ ,,	৪ ,,	২৫ ,,
তৃতীয় মাসের আরম্ভে		৬ ,,	২৭ ,,	৩ ,,	৩০ ,,

চা চামচের ৮ চামচে এক আউন্স হয়, একটী ছোট কাঁচের গেলাসে মাপ ঠিক করিয়া রাখা যাইতে পারে। তৈয়ারী দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় নাড়িয়া লইতে হয়।

কিরূপভাবে দুধ খাইতে দেওয়া উচিত

"ঢোকা" খাওয়াইলেও শিশুকে মাতৃস্তন দিবার সময়ের মত কোলে করিয়া খাওয়াইতে হয়।

"মাই বোতল" যাহাতে সহজে পরিষ্কার করা যায় ও রবারের মুখ, যাহাতে উল্টাইয়া পরিষ্কার করা যায়, এই প্রকারই হওয়া উচিত। লম্বা নলযুক্ত কোন প্রকার মাই বোতল ব্যবহার করা অন্যায়।

দুধ খাওয়াইবার পরই মাইবোতল ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া গরম জলে সোডা মিশাইয়া ধুইবার পর পুনরায় ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া রাখা কর্ত্তব্য। রবারের মুখ গরমজলে লবণ মিশাইয়া ধোয়া কর্ত্তব্য—পরে মুছিয়া পরিষ্কার একটী কৌটায় রাখিয়া দিতে হয়—রবারের মুখ প্রত্যহ একবার গরম জলে ধোয়া উচিত।

মনে রাখা উচিত, বোতল বা রবারের মুখ অপরিষ্কার থা কলে শিশুর পেটের রোগ জন্মাইতে পারে।

শিশুর ওজনের তালিকা

জন্ম সময়	...	৭ পাউণ্ড বা ৩½ সের
তৃতীয় দিবস	...	৬¾ পাউণ্ড
দশম দিবস	...	৭ পাউণ্ড
চতুর্থ সপ্তাহ	...	৮ পাউণ্ড বা ৪ সের

শিশুকে মধ্যে মধ্যে ওজন করিলে তাহার আহার ও পরিপুষ্টি কিরূপ হইতেছে বোঝা যায়।

পোষাক

শিশুর চাপা ও জামা বেশ হাল্কা হওয়াই ভাল; এবং যে কাপড় সাবান দিয়া কাচা যায় এইরূপ হাল্কা, নরম কাপড়েরই হওয়া উচিত। শিশুকে বেশী জামা ও অত্যধিক গরমে রাখিলে সে অসোয়াস্তি অনুভব করে এবং আমাদের দেশে ঘামাচি প্রভৃতি উপসর্গ হয়। নাড়ী পড়িয়া গেলেই পেট বাঁধা

খুলিয়া দিতে হয় এবং আর ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। শিশুর জামা, নেকড়া প্রভৃতি ঋতু ও আবহাওয়া অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক; এবং জামা প্রভৃতি ঢিলা হওয়াই ভাল; টাইট জামা শিশুর পক্ষে অনিষ্টজনক। প্রস্রাবে ভিজা বিছানায় শিশুকে ফেলিয়া রাখা অন্যায়।

শিশুর নেকড়া বা জামা প্রভৃতি সামান্য সাবান জল দিয়া প্রত্যহ কাচিয়া লওয়া উচিত; সোডার জলে বা বেশী সাবান দিয়া কাচার আবশ্যক নাই, কারণ ইহাতে শিশুর নূতন কোমল ত্বকে জ্বালা যন্ত্রণা হইতে পারে।

বিছানা, বিশুদ্ধ বাতাস ও রৌদ্র

বিশুদ্ধ বাতাস, শিশুর ঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (২২,৬৬,৮৩,পৃষ্ঠা)। শিশুকে কপাট বা জানালার নিকট শুইতে না দিয়া ঘরের এক পার্শ্বে শুইতে দিতে হয়, কিন্তু বায়ু চলাচলের জন্য জানালা বা কপাট খোলা থাকা আবশ্যক।

রৌদ্র শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী; অতি ছোট শিশু রৌদ্র হঠাৎ সহ্য করিতে পারে না—তাহাকে ধীরে ধীরে সহ্য

করাইয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে শিশুকে তৈল মাখাইয়া "রৌদ্রে দেওয়া"র প্রথা বেশ সুন্দর ও উপকারী।

শিশুকে অন্য বিছানায় শুইতে দেওয়াই উচিত; মাতার সহিত এক বিছানায় শুইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে—ইহাতে উভয়েরই বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় এবং অনেক সময় অনর্থও ঘটে। শিশুর বিছানা বেশ নরম হওয়া উচিত। বন্ধঘরে শিশুকে শোয়াইলে প্রায়ই শর্দ্দি কাশীর উপদ্রব হইবে এবং তাহার স্বাস্থ্যহানিও হইয়া থাকে।

স্নান

বন্ধ ঘরেই শিশুকে স্নান করান উচিত; ঋতু হিসাবে স্নান করান আবশ্যক; আমাদের দেশে গরম কালে প্রত্যহ স্নান করান যাইতে পারে। কিন্তু শিশুর পাছা প্রত্যহ পরিষ্কার ভিজা নরম নেকড়া দিয়া পুঁছাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক, চোখ, কান ও শরীরের খোঁজ, মাথা, বগল, কুঁচকি প্রভৃতি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। শিশুর মুখ নেকড়া দিয়া মুছাইয়া দেওয়া বা অঙ্গুলী দিয়া পরিষ্কার করার চেষ্টা

অন্যায় ও হানিজনক। স্নানের পর শিশুকে ভাল করিয়া মুছাইয়া জামা পরাইবার পর ঘরের কপাট জানালা খুলিয়া দেওয়া উচিত। যদি পাছা লাল হইয়া উঠে, তৈল বা মাখন লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি শিশুর শরীর খারাপ থাকে, তেলে ভেজান নেকড়া দিয়া তাহাকে মুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

শিশুর সমস্ত বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য ; মাইবোতল সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত।

মাতার স্তনের বোঁটা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক।

শিশুর ব্যবহারের নেকড়া, জামা, বিছানা প্রভৃতি পরিষ্কার থাকা উচিত।

মাতার হাত বিশেষতঃ শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবার সময় পরিষ্কার করা দরকার।

শিশুর চক্ষু পরিষ্কার থাকা আবশ্যক।

প্রস্রাবের পথ প্রত্যহ পরিষ্কার করা বিধেয়।

শিশুর স্তন শক্ত হইলে, অনেকে জোর করিয়া টিপিয়া দুধ বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করেন—ইহাকে চলিত ভাষায় "ঘুঁটি ভাঙ্গা" বলে। শিশুর স্তন শক্ত হইলে—বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক এবং খানিকটা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে আপনিই ভাল হইয়া যায়; যদি লাল হয় বা ফুলিয়া উঠে তবে ডাক্তারকে দেখান আবশ্যক—কারণ 'বিষাইয়া' উঠিয়া স্তনে স্ফোটক হইতে পারে।

সমস্ত কার্য্যই বাঁধা নিয়মে করা উচিত

শিশুর আহার, স্নান, নিদ্রা, পুরীষনির্গম সমস্ত কার্য্যই বাঁধা নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এইগুলি সমস্তই অভ্যাসমূলক এবং অভ্যাস করাইলেই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হয় ও ভবিষ্যত জীবন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে।

নিদ্রা

শিশুকে মাতা বা ধাত্রীর সহিত এক বিছানায় শুইতে দেওয়া উচিত নহে।

যদি রাত্রে শিশু ক্রন্দন করে তবে তাহাকে দুই চামচ ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া উচিত; ভেজা বিছানা, যদি ক্রন্দনের কারণ হয়, বিছানা বদলাইয়া পাশ ফিরাইয়া শোয়াইয়া দিলেই শিশু পুনঃ নিদ্রা গিয়া থাকে। রাত্রে ১০ টার পর শিশুকে কিছু আহার করিতে দিবার আবশ্যক নাই।

শিশুর পক্ষে নিদ্রা ও বিশ্রাম বিশেষ আবশ্যকীয়—কোনরূপে ইহার ব্যাঘাত করা অন্যায়।

রবার চুষি প্রভৃতি

শিশুকে রবার চুষি প্রভৃতি দেওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাতে হজম শক্তির ব্যাঘাত ঘটে, মুখে ঘা প্রভৃতি হইতে পারে এবং মুখের গঠন খারাপ হইবার সম্ভাবনা।

কোষ্ঠ

প্রথম ২।৩ দিন কাল, সবুজ, বা পাঁশুটে রংয়ের পুরীষ নির্গম হয়, পরে ইহা হলুদাভ, নরম হওয়া উচিত। প্রথম সপ্তাহে ৩।৪ বার ও পরে ১ বার কি ২ বার পুরীষ নির্গম হওয়া উচিত।

নবজাত শিশুকে কোন প্রকার জোলাপ দেওয়া উচিত নহে। ৪।৫ চা চামচ গরম জলই কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। আটার মত স্তনের দুগ্ধ ও মুখের লালা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে সহায়তা করে।

যদি সবুজ রংয়ের, লালাযুক্ত বা দুধকাটার মত পুরীষ নির্গম হয় তবে শিশুর পেটের অসুখ হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

যদি মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং সাধারণ নিয়মগুলি প্রতিপালন করা হয়, তবে শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য হয় না। প্রথম মাসে যে সামান্য কোষ্ঠ কাঠিন্য হয় তাহা পরে নিজেই

সারিয়া যায়। বিশেষ কোষ্ঠ কাঠিন্য হইলে চুনের জলের পরিবর্ত্তে "লিকুইড ম্যাগনেসিয়া" দুধের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বমি ও দুধতোলা

যদি শিশু 'দুধ তোলে' তবে তাহার অতিরিক্ত আহার হইতেছে বুঝিতে হইবে। স্তন পান করাইবার সময়, অল্পক্ষণস্থায়ী করিয়া দিলেই চলিবে।

পেটের অসুখ বা অতি ভোজন, শিশুর বমি করার কারণ।

পেটের অসুখ

পেটের অসুখ শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিজনক; "বিলাতী দুধ", "ঢোকা" বা গরুর দুধ খাওয়াইলে গরমের সময় প্রায়ই পেটের গোলমাল হইয়া থাকে। স্তনপায়ী শিশুর এই উপদ্রব খুব কম হয়, কিন্তু মাতার শরীর খারাপ হইলে বা পেটের গোলমাল হইলে সন্তানের হজমের ব্যাঘাত

ঘটিতে পারে। যদি মাইবোতল অপরিষ্কার হয়, বা "অপরিষ্কার কোন বস্তু" মুখে যায়, তাহাতেও পেটের অসুখ হইতে পারে।

সবুজ রংয়ের পুরীষ, বমি বা বার বার পাতলা পুরীষ নির্গমই ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ। এই সময় ১ চা চামচ 'ক্যাষ্টর অয়েল' দিতে হয় ও একেবারেই দুধ খাওয়ান বন্ধ করিয়া দিতে হয় ; এবং ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কেবল ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঈষদুষ্ণ গরমজল খাইতে দিতে হয়। ১২ ঘণ্টার পর ৮ চা চামচ জল খাইতে দিবার পর অল্প সময় মাতৃস্তন পান করিতে দেওয়া উচিত ; কিন্তু এই ১২ ঘণ্টার মধ্যেও, স্তন হইতে ৪ ঘণ্টা অন্তর দুধ বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যদি ইহাতেও পেটের অসুখ না সারে, তবে শিশুকে মাতৃ-দুগ্ধ স্তন হইতে বাহির করিয়া, ২ ঘণ্টা রাখিয়া দিয়া, উপরের অংশ ফেলিয়া দিয়া, তলার অংশ "মাইবোতলে" খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। যদি এই দুগ্ধও শিশুর পক্ষে দুষ্পাচ্য হয় তবে ছানার জল ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। পরে ছানার জল সহ্য হইলে, ২ চামচ করিয়া মাতৃদুগ্ধ গরম করিয়া ছানার জলে মিশাইয়া দিতে হয়, এবং উত্তরোত্তর ছানার

জলের পরিমাণ কমাইয়া সেইমত দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত; পরে পুনরায় কেবল স্তন পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

যদি উপরোক্ত ব্যবস্থাতেও পেটের অসুখ না সারিয়া যায় তবে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া উচিত।

পেট ব্যথা ও পেট ফাঁপা

পেট ব্যথা বা পেট ফাঁপা শিশুর প্রথম মাসে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, পেটের অসুখ, বদহজম, অতি ভোজন, অপরিষ্কার খাদ্য ও মাইবোতল ইহার কারণ— এই গুলির ব্যবস্থা করিলে পেট ব্যথা বা পেট ফাঁপা প্রায়ই হয় না। কালমেঘের পাতা, বড় এলাচের খোসা, জোয়ান, মৌরী সামান্য জলে ভিজাইয়া খুব ভাল ভাবে বাটিয়া লইয়া তাহার বড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয় এবং প্রত্যেক রবিবারে ১টী বড়ি মাতৃ দুগ্ধে গুলিয়া খাইতে দেওয়া ভাল; ইহাতে পেটের দোষ জন্মাইতে পারে না। ইহাই "আলুই" বড়ি নামে প্রচলিত।

পেট ব্যথা করিলে শিশু খিটখিটে হয়, ছটফট করে, কপাল কুঁচকাইয়া থাকে, এবং অতিরিক্ত ক্রন্দন করে। এই সময় একেবারে আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত এবং পেটে ফ্লানেল গরম জলে নিংড়াইয়া সেঁক দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। রাত্রে আহার করিতে দিতে নাই, তৎপরিবর্ত্তে গরম জল ৪।৫ চামচ দেওয়া যাইতে পারে। যদি মাতার আহারের দোষে মাতৃদুগ্ধ দুষিত হইয়া থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

যদি ইহাতেও পেটব্যথার উপশম না হয়, তবে মৌরি ও জোয়ানের জল ও এক চিমটি পরিমাণ গুঁড়া সোডা মিশাইয়া শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে। শিশুকে কোলে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া পিঠের উপর চাপড়াইলে সে আরাম পাইয়া থাকে; বেশী পেট ফাঁপা থাকিলে বুকে ফেলিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিলে শিশু বিশেষ আরাম অনুভব করে। অত্যন্ত পেট কামড়াইলে—গুহ্যদ্বার দিয়া ২ আউন্স বা ১৬ চা চামচ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ৫।৬ চিমটি লবণ জলের পিচকারী দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

সর্দ্দিকাশি

শিশুদের প্রায়ই সর্দ্দিকাশি ও জ্বর হইতে দেখা যায়—অসাবধানতাই ইহার প্রধান কারণ, যথা, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগান, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া, ভিজা বিছানায় অধিক্ষণ ফেলিয়া রাখা ইত্যাদি। অল্প সর্দ্দিকাশি যাহাকে চলিত ভাষায় 'বালসান" বলে সাবধান থাকিলে, হয় না; এবং ইহা অল্পেই সারিয়া যায়। তুলসী পাতার রস ৫।৬ ফোঁটা ও মধু এই প্রকার সর্দ্দিকাশির পক্ষে বেশ উপকারী; কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে ৪।৫ চামচ গরমজল দিনে ২।৩ বার দিলে বেশ উপকার হয়। সর্দ্দিকাশি বেশী হইলে এক বাটী ফুটন্ত জলে ১০।১৫ ফোটা "ইউক্যালিপটাস অয়েল" ও ১০।১৫ ফোটা "টিনচার বেনজোয়েন কো" দিয়া তাহার ভাপ, বন্ধ ঘরে শিশুকে দিলে সর্দ্দিকাশির উপসম হয়। খাঁটী ঈষদুষ্ণ সর্ষপ তৈল একটু কর্পূর কিংবা মাষকলাই দিয়া বুকে, গলায়, হাতে ও পায়ে মালিস করিয়া দিলে সর্দ্দির বেশ উপকার হয়। যদি জ্বর বেশী হয় কিংবা না ছাড়িয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায় তবে অবিলম্বে ডাক্তার দেখান কর্ত্তব্য। যাঁহারা আঁতুড়ে সেঁক লইয়া ও শিশুকে সেঁক দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেঁক বন্ধ করিবার পর, বিশেষতঃ শীতকাল হইলে, শিশুকে

অল্প সেঁক দিয়া ধীরে ধীরে অভ্যাস ছাড়ান দরকার নতুবা ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা।

ডিপথিরিয়া

জ্বর ও সর্দ্দির সহিত যদি শিশুর গিলিবার কোনপ্রকার কষ্ট হয় কিংবা স্তন পান করিতে কষ্ট পায়, তবে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখান উচিত এবং গলায় কোনপ্রকার ক্ষত হইয়াছে কি না দেখা কর্ত্তব্য। শিশুগণের এই প্রকার উপসর্গ হইলে "ডিপথিরিয়া" নামক সাংঘাতিক ব্যাধি হইয়াছে কি না সুনিশ্চিত করা আবশ্যক, কারণ এই ব্যাধি যদি আরম্ভেই ধরা যায় ও সুচিকিৎসা হয়, তবে প্রাণহানির সম্ভাবনা কম। যদি একটী বাড়ীতে কোন সন্তানের 'ডিপথিরিয়া' হইয়া পড়ে অন্যান্য শিশুদিগকে "ডিপথিরিয়ার" ঔষধের ইনজেকসন দেওয়া কর্ত্তব্য—ইহা বসন্তের টীকার মত কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে এই ভীষণ ব্যাধি হইতে রক্ষা করে।

মুখে ঘা

মুখের মধ্যে, জিহ্বায়, গালে ও ঠোঁটে ছোট ছোট ঘা শিশুর অসুস্থতা ও তাহাকে অপরিষ্কার রাখিবার লক্ষণ; সুতরাং চিকিৎসক দেখান উচিত।

এই সময় মুখে নেকড়া দিয়া ধোয়াইয়া দেওয়া, চিনি বা মিছরি খাইতে দেওয়া বা বিলাতি দুধ দেওয়া অন্যায়। সিকি চা চামচ বোরিক এ্যাসিডে ১ আউন্স গ্লিসিরিন মিশাইয়া, কাটিতে তুলি করিয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ভাল।

ঘামাচি

শিশুকে খুব বেশী জামা কাপড় দিয়া ঢাকা রাখিলে তাহার গায়ে ঘামাচি, ও চলিত কথায় যাহাকে "মাসীপিসি" বলে, প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হয়; কারণ গায়ের ঘাম নিঃসরণ হয় না। ঘামাচি হইলে বেশ ভাল করিয়া গা ধোয়াইয়া দিয়া গায়ে বোরিক এ্যাসিড যুক্ত পাউডার দেওয়া ভাল; যে জলে গা ধোয়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে একটু গুড়া সোডা মিশাইয়া দিলেও উপকার হয়। এই চর্ম্মরোগ "মিলমিলে" বা হাম কিনা,

সঠিক নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

পাছা ও পিট লাল হইয়া উঠা

অপরিষ্কার বিছানায়, শক্ত বিছানায় অথবা প্রস্রাবের নেকড়া না কাচিয়া ব্যবহার করিলে শিশুর পাছা লাল হইয়া ওঠে এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইহার প্রতীকার করা উচিত।

যদি পাছা লাল হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হয়, তাহার উপর নারিকেল তৈল বোরিক এ্যাসিডের গুড়া মিশাইয়া লাগাইয়া দিতে হয় এবং বিছানা বা অপরিষ্কার নেকড়া যাহাতে ব্যবহৃত না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

তড়কা

দুর্ব্বল শিশুর অন্য কোন রোগ হইলেই প্রায় "তড়কা" বা ফিট হয়—সুতরাং সাধারণ নিয়ম গুলি প্রতিপালন করিয়া যাহাতে শিশু দুর্ব্বল না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলের

কর্ত্তব্য। অপরিষ্কারে থাকা, অনিয়মে খাওয়ান, বদ্ধ ঘরে শয়ন, প্রভৃতি শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ, এবং জ্বর, পেট কামড়ান প্রভৃতি হইলেই "তড়কা" হইয়া থাকে। তড়কা হইলে চক্ষুর তারা একপেশে হইয়া থাকে, হাত পা ঘামিতে থাকে বা ঠাণ্ডা হইয়া যায় ও শিশুর ঘাড় শক্ত হইয়া যায় বা সাময়িক বেঁকিয়াও যায়। এইরূপ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

তড়কা হইলে শিশুকে ১৬ চা চামচ গরম জলের গুহ্যদ্বারে পিচকারী দেওয়া উচিত ও তৎপরে যখন শিশু গিলিতে পারে তাহাকে ১।২ চামচ "ক্যাষ্টর অয়েল" দেওয়া উচিত। তড়কা হইলে ঈষদুষ্ণ জলে শিশুকে স্নান করাইয়া তৎক্ষণাৎ শুকনা তোয়ালে দিয়া—গা মুছাইয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

সন্তান সম্বন্ধে মনে রাখা কর্ত্তব্য

(১) সদ্যজাত শিশুকে "ক্যাষ্টর অয়েল" বা অন্য কোন প্রকার জোলাপ দেওয়া অনুচিত।

(২) শিশুকে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করা মহা অন্যায়; যদি কোন কারণে মাতার দুগ্ধের অল্পতা হয় তবে অন্য প্রকার

খাত্ত দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু যতটা মাতৃদুগ্ধ সম্ভব, তাহা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

(৩) সুস্থ শিশুকে নিয়মিত পরিমাণে ও সময় মত খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য—সময় বা পরিমাণের ব্যতিক্রম করা উচিত নহে।

(৪) শিশুকে রাত্রে কিছু খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

(৫) সহজে মাতৃস্তন ছাড়ান অন্যায়।

(৬) শিশুকে মধ্যে মধ্যে ওজন করা ভাল।

(৭) তৈয়ারী করা গোদুগ্ধ পুরামাত্রায় প্রথমে দেওয়া আপত্তিজনক এবং প্রত্যেকবার খাওয়াইবার সময় দুগ্ধ নাড়িয়া লওয়া উচিত।

(৮) হঠাৎ কোন বিষয় পরিবর্ত্তন শিশুর পক্ষে আপত্তিজনক।

(৯) প্রত্যহ শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া উচিত।

(১০) শিশুর দুগ্ধ, পরিষ্কার নেকড়া দিয়া ঢাকা দিয়া রাখা উচিত—বদ্ধ পাত্রে রাখা উচিত নহে।

(১১) শিশুকে রবারের চুষি বা আঙ্গুল চুষিতে দেওয়া অন্যায়।

(১২) শিশুর মুখ নেকড়া দিয়া ধোয়ান অন্যায়, ইহাতে মুখে ঘা হয়।

(১৩) পেটেণ্ট ফুড বা দুধ শিশুর আহার নহে।

(১৪) শিশুর মুখ ঢাকা দিয়া ঘুমাইতে দেওয়া অনুচিত।

(১৫) শিশুকে মাতা বা অন্য কাহারও সহিত শুইতে দেওয়া অনুচিত—কিংবা কোলে ঘুমপাড়ানর অভ্যাস করাও ভাল নহে।

(১৬) শিশু ক্রন্দন করিলে কোন কারণ থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত—পেটব্যথা, ভিজা বিছানা, জল পিপাসা ও শারীরিক অসুস্থতা ও বদ অভ্যাসই ক্রন্দনের প্রধান কারণ।

(১৭) শিশুর স্তনে "ঘুঁটি" ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য জোরে টেপাটিপি করা অন্যায়—ইহাতে ফোড়াও হইতে পারে।

(১৮) শিশুর অভ্যাস আমরাই গড়িয়া তুলি এবং তাহার জন্য আমরাই দায়ী।